হাইলাকান্দি
বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন
২০২৪ ইং
দেবী দুর্গার
উৎস সন্ধানে
যাদুর দেশ মায়ং
ভূতের মার্বেল খেলা
আলি আমজদের ঘড়ি
চ্যালেঞ্জের মুখে
মুসলিম রাজনীতি
সোনালির বিশ্বরেকর্ড

উৎসবের দিনগুলিতে সকলের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচে যাক, মনে রঙ লাগুক,
কাশফুলের মতন দুলে উঠুক সকলের মন....

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন –

সুজাম উদ্দিন লস্কর

বিধায়ক, কাটলিছড়া

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কামনা করি পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক -

লালা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড

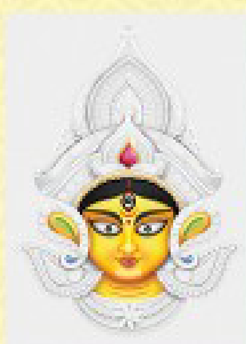

অভিজিৎ বে
এগজিকিউটিভ অফিসার

তুরসি রায়
চেয়ারপার্সন

লালা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, লালা

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

হাইলাকান্দি

RNI Regd No- Rn- 64351/96

বর্ষ - ২৯, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৪

উৎসবের আনন্দে সাহিত্যের ছন্দে

শারদ সংখ্যা

২০২৪

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
নুরুল মজুমদার

মুখ্য সম্পাদক
অমিত রঞ্জন দাস

সম্পাদক ও প্রকাশক
জেরিন আক্তার মজুমদার

অলঙ্করণ
কবীর মজুমদার

সহযোগিতায়
নজমুল ইসলাম তাপাদার

বর্ণ বিন্যাস
নূর আহমেদ চৌধুরী

মুদ্রণে:
মেসার্স নিউ জামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হাইলাকান্দি - ৯৪৩৫২২০০০৯

যোগাযোগ
সম্পাদক, হাইলাকান্দি
(বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন)
কলেজ রোড, লালা, ওয়ার্ড নং:-১০
পো:-লালা-৭৮৮১৬৩, হাইলাকান্দি
অসম।
email-nmazumderhkd@gmail.com
Cell-8638898750/9435179030
E-Magazine : hailakandimagazine.com

মূল্য ঃ ₹ ১০০ টাকা মাত্র।

সূচিপত্র

১। **সম্পাদকীয়**	মহামিলনের উৎসব	২
২। **দেবী প্রসঙ্গ**	শক্তিরূপিনী দেবী দুর্গার উৎস সন্ধানে	৩
	দুর্গার আগমন ও গমনের শুভ-অশুভ	৪
	যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজা: প্রবাসী বাঙালিদের এক প্রাণবন্ত উদযাপন	৫
৩। **প্রচ্ছদ নিবন্ধ**	যাদুর দেশ মায়ং	১০
	ব্ল্যাক ম্যাজিক আসামের মায়ং গ্রাম	১১
	রহস্যময় গ্রাম মায়ং , আগ্রহের শেষ নেই	১১
৪। **রাজনীতি**	চ্যালেঞ্জের মুখে রাজ্যের সংখ্যালঘু রাজনীতি, দিশাহীন মুসলিম সমাজ	১৩
	মুসলিম সমাজের উত্তরণে প্রাসঙ্গিক ভাবনা	১৫
	তৃণমূলের রাজনীতি এবং সুস্মিতার ভবিষ্যৎ	১৬
৫। **সত্য কাহিনী**	ভূতের মার্বেল খেলা	১৮
৬। **জীবন বৃত্তান্ত**	আমার জীবন যুদ্ধ	২১
	আমি ত্রিশ বছরের হয়ে থাকবো	২৫
৭। **আলোকপাত**	পরকীয়া ঃ কাঠগড়ায় কে ?	২৬
৮। **গল্প**	জীবনের ঘূর্ণিপাকে	২৭
	অন্বেষণ	৩৫
	অন্তর্দাহ	৩৭
	বিড়ম্বনা	৩৯
	এই প্রেম গল্প নয়	৪০
	সন্ধ্যামনি	৪৬
	স্বাধীনতার স্বাদ	৪৭
৯। **কবিতা**	উপেক্ষিতা উর্মিলা / ঘুমটা যখন ভাঙ্গে/ আভয়াময়ী মা / জীবন জাহাজ / সংযম / ধর্ম ধর্ম ধর্ম / শিউলিছোপা মেয়েবেলা / এ কোন মহারাজা / সিংলা থেকে মহাবাহু / সভ্যতার ভগ্ন স্তুপ / সমন্বয় তলানিতে / শ্রাবণের রাতে / বরাক বাংলা / দেবদাস / ফোন করেনি ঈশ্বরী / ছাদ / জীবন-যন্ত্রণা	৪৯-৫৩
১০। **ইতিহাস**	আলি আমজদের ঘড়ি	৫৪
	বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অনালোচিত দিক	৫৮
	'হাইলাকান্দি' জেলা : অতীত ও বর্তমান	৬০
১১। **অনুসন্ধান**	মানব সভ্যতায় গোয়েন্দাগিরি	৬৩
	হাইলাকান্দির শিববাড়ি দুর্গাপূজার একাল-সেকাল	৬৬

সম্পাদকীয়

মহামিলনের উৎসব

মেঘের আদ্রতা কাটিয়ে আকাশে এখন নীলাভ রঙ । বিকালের সোনাঝরা রোদ বার্তা দিচ্ছে শারদীয় উৎসবের। শিউলী শেফালিকার গন্ধে উৎসবমুখর পরিবেশ । আনন্দময়ীর আগমনে মেতে উঠেছে পৃথিবীলোক। উৎসবে সামিল আপামর মানুষ ।সব উৎসবের একটি মাহাত্য রয়েছে ।তা হলো একে অন্যের মধ্যে ভেদাভেদ, জাতি সত্তার ভেদাভেদ, সর্বোপরি হালফিলের ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে প্রাণ খুলে চলা। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দেওয়া ।আর তখনই আসে উৎসবের পূর্ণতা ।আর তখন যে কোন ধর্মকে সামনে রেখে যে উৎসবই আসুক না কেন তা বিশ্বজনীন রূপ পাবে সহজেই। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজা কিংবা শারদ উৎসব আজকাল আর ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। শারদীয় দুর্গোৎসব এখন এক বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়ছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের আপামর মানুষ এই উৎসবের অংশিদার হয়ে বিভিন্ন কারনে। সে ব্যবসার নিরিখে হউক কিংবা প্যাণ্ডেল তৈরির দিনমজুরি হউক কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে হোক।

বর্ষার বিদায় আর শীতের আগমনের এই সময় এক মনোরম পরিবেশে আয়োজিত শারদীয় উৎসব মানুষে মানুষে মহামিলনের সৃষ্টি করে। গড়ে তুলে ঐক্যতান। বিশ্বজনীন মহামিলনের উৎসবের হাতধরে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয় ।এই ছিল এতদঞ্চলের পরম্পরা। কিন্তু কুটিল রাজনীতির চক্রপাকে এখন সমাজ ঘোরপাক খায়। মনে না চাইলেও অনেক কিছু পরিস্থিতির চাপে মেনে নিতে হয় ।মানুষ যে সমাজ বদ্ধ জীব সময়ে সময়ে আমরা এই বাস্তব সত্যটিকে ভুলে যাই। ন্যস্ত স্বার্থে বিভাজনের বিষবাষ্পকে সাদরে গ্রহন করি।

এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু চাইব উৎসবের এই পবিত্রতা যেন যাবতীয় বিভাজনকে এক করে সমাজকে নতুন দিশা দেখায়। পাশাপাশি রাজনীতির কালো দাগ মুক্ত হয় সমাজ। সার্বজনীন এই উৎসব মানুষের মিলন ও সামাজিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করুক। গড়ে উঠুক ঐক্যতান ।তাই সব মলিনতা ঝেড়ে ফেলে শারদ উৎসব হয়ে উঠুক এক মহামিলনের উৎসব।

দেবী প্রসঙ্গ

শক্তিরূপিনী দেবী দুর্গার উৎস সন্ধানে

দেবযানী চৌধুরী

নারী মহাশক্তি। নারীই দেবী দুর্গা-কালী, নারীই সীতা- সাবিত্রী- বেহুলা- দময়ন্তী। সংসারে-পরিবারে নারী দশভূজা। নারীই সৃষ্টির গৌরব।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে নারী কোমলতার প্রতীক, ভোগ্য সামগ্রী, সেখানে 'শক্তি-রূপেন সংস্থিতা' দেবী দুর্গার মহিষাসুর-মর্দিনীরূপ স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী-নেতৃত্বের কথা। নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ছিল আদিম মানব সমাজের কাছে বিস্ময়। তাই প্রাচীন সমাজগুলোতে মাতৃদেবীর পুজোই ছিল প্রধান। দেবী মাহাত্মের পৌরাণিক আখ্যানগুলো মাতৃতন্ত্রের অবশেষরূপে সমাজে টিকে ছিল বহুকাল। পরবর্তীতে পুরুষতন্ত্র যত শক্তিশালী হয়েছে তত পুরুষ দেবতারা ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং প্রধান দেবীরা চলে গেছেন দ্বিতীয় অবস্থানে; কখনও প্রধান দেবতার স্ত্রী, কখনও কন্যারূপে। সুমেরিয়া, মিশর, গ্রিস, প্রাচীন ভারত- সর্বত্রই এটি ঘটেছে। মাতৃরূপে দেবী সংস্কৃতির ধারণা অতি প্রাচীন। পৌরাণিক ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পুজোর প্রচলন ছিল। প্রায় ২২ হাজার বছর পূর্বে ভারতে প্যালিওলিথিক জনগোষ্ঠী থেকেই দেবী পুজোর প্রচলন হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতায় এসে তা আরো গ্রহণযোগ্য ও প্রসারিত হয়।

মাতৃপ্রধান পরিবারের মা-ই প্রধান শক্তি। তাই মাকে কেন্দ্র করে দেবী বিশ্বাস গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে শাক্ত সম্প্রদায় মত। এই মত অনুসারে দেবী হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। শাক্ত মতে, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে 'দুর্গা' নামের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে- দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিত। উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।। রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ। ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।। দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপনাশক ও অ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, 'দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা'-অর্থাৎ, দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

দেবী দুর্গা সাত্ত্বিক, সিংহ রাজসিক ও অসুর তামসিক শক্তির প্রতীক। দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী, ঐশ্বর্যপ্রদায়িনী দেবী লক্ষ্মী, সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ, শক্তিরূপী কার্তিক এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক মহাদেব। দুর্গাপুজোয় একই সঙ্গে শক্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, সিদ্ধি, বল ও বৈরাগ্যের সমাবেশ । জ্ঞান, বিদ্যা, মানসিক ঐশ্বর্য, বল ও বৈরাগ্যের মাধ্যমেই অসুর বিনাশ করে জগতের দুর্গতিনাশ সম্ভব। বাঙালির দুর্গাপুজোর অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, দুর্গার মতো শক্তিময়ী, অস্ত্রধারী ও জগদ্ধাত্রী দেবীকে কন্যারূপে ও মাতৃরূপে কল্পনা করা। বাঙালির দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে, বছরে তিনটি দিনের জন্য সে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে আসে। দেবী আরাধনার যে রূপবদল সেটা বাঙালির একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

আবহমানকাল থেকে সমগ্র বঙ্গদেশে মাতৃদেবীর পুজো প্রচলিত ছিল। কখনও স্থানীয় অনার্য দেবীরূপে, কখনও আর্যদেবী রূপে বিভিন্ন নামে নারীশক্তির আরাধনা হয়েছে। তবে শারদীয় দুর্গাপুজোর বর্তমান যে রূপ আমরা দেখি, তার বিকাশ মধ্যযুগে। তথ্য মতে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। তার আগে, দশম ও একাদশ শতকেও বাংলায় দুর্গাপুজো প্রচলিত ছিল বলে গবেষকদের অনুমান।

মানবমনে যে অসুরের বাস , তার বিনাশ করার মাধ্যমেই মহাশক্তির জয়। দুর্গোৎসব এই অসুর বিনাশের প্রতীক। আজকের দিনেও আমাদের চারপাশে এই অসুরের দাপট । ডাক্তার মৌমিতা হোক, পিংকি হোক, কিংবা বর্ণালী, কিংবা মনিপুরের দুই মহিলাকে নগ্ন করে রাজপথে ঘুরিয়ে ধর্ষণ করা, সব ঘটনাই মিলেছে একই মূলসূত্রে। মানুষের মননের অদম্য আসুরিকতা । দিল্লির রাস্তায় উনিশ বছরের মেয়েটিকে প্রেমিক ছুরি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল, পাথরের বারংবার আঘাতে মাথা থেঁতলে দিল। শিলচরে পিংকিকে ধর্ষণ করে মুখে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখল প্রেমিক । কতোটা নৃশংসতা-প্রতিহিংসাপরায়নতা মননে রোপিত থাকলে মানুষ এতটা পিশাচ হতে পারে। ২০০৭ সালে গুয়াহাটির রাজপথে সাঁওতাল মেয়ে লক্ষ্মী ওরাংকে নগ্ন হতে বাধ্য করা হলো। ২০২৩ এ মনিপুরের রাজপথে প্রতিহিংসার উল্লাসে মেতে পিশাচ পুরুষের দল দুই মহিলাকে নগ্ন করে রাজপথে হাঁটিয়ে , তাদের যৌনাঙ্গ, স্তনে হাত বুলিয়ে, ধর্ষণ করে পাশবিক পরিতৃপ্তি পেলো।

যে নারী শক্তির বন্দনা করা হয়, যে নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করা হয়, সেই নারীই পুরুষের পৈশাচিকতার শিকার। আজ দুর্গাপুজো আমাদের কাছে শুধুই আনন্দের উৎসব । দেবী আরাধনার মাহাত্ম্য রয়ে যায় অন্তরালে। দেবী আরাধনার সার্থকতা নারী শক্তির জাগরণে। নারীর বিরুদ্ধে সব আসুরিক শক্তির নিধনে দেবীবন্দনার সার্থকতা। নারীর মধ্যে জেগে উঠুক অসুর-বিনাশিনীর পরম শক্তি। বাস্তব মাটির নারী হয়ে উঠুক দেবী দুর্গা-কালী।

দুর্গার আগমন ও গমনের শুভ-অশুভ

মনিকঙ্কনা দাস (নাথ)

চারিদিকে এক অস্থির সময়। তবু তার মাঝেই বেজে উঠেছে দেবী দুর্গার আগমনীর সুর। বিশ্বচরাচর যার আরাধনায় মেতেছে সেই "দেবী" কিন্তু একজন "নারী"। অথচ আমাদের এই সমাজে "নারী একেবারেই নিরাপদ নয়" এই অভিযোগ 'নারীর' মর্ত্যের নারী নামক মানুষটির অপমান, অভিযোগের মাঝেই প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে 'নারী শক্তির' আরাধনার।

শরৎ মানেই আকাশে বাতাসে মায়ের আগমনী বছরভরের অপেক্ষা পুরোনোর সময়। মহালয়াতেই সূচনা হয় দেবীপক্ষের। দেবী দুর্গার আগমন এবং গমনের বাহন ও তার ফলাফল নিয়ে সমাজে বহু কথা প্রচলিত। মা দুর্গার পুত্র কন্যার এক একটি নিজস্ব বাহন থাকলেও, দেবীর আগমণ ও গমনের বাহনের কথা পৃথক পৃথক ভাবে পঞ্জিকায় উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী দেবী দুর্গার মর্ত্যে আগমন ও গমন যে বাহনে তার উপর নির্ভর করে গোটা বছরটা পৃথিবীবাসীর কেমন কাটবে।

প্রত্যেক বছর দুর্গার আগমন ও গমন সাধারণত একই বাহনে হয় না। যদি কোন বছরে দেবীর আগমন ও গমন একই বাহনে হয় তাহলে খুব শুভ ইংগিত বহন করে।

পঞ্জিকা মতে পুজোর সপ্তমীতে হয় দেবীর আগমণ ও গমন হয় দশমীতে। শাস্ত্রমতে, সপ্তমী রবিবার বা সোমবার হলে দেবীর বাহন হয় গজ বা হাতী। সপ্তমী যদি শনি বা মঙ্গলবার হয় তাহলে দেবীর বাহন হয় ঘোটক বা ঘোড়া। সপ্তমী বৃহস্পতিবার শুক্রবার হয় তাহলে দেবীর বাহন হয় দোলা বা পাল্কী। সপ্তমী বুধবার হলে দেবীর বাহন নৌকা। দশমী রবিবার বা সোমবার হলে দেবীর বাহন গজ। দশমী শনি বা মঙ্গলবার হলে দেবীর গমন হবে ঘোটকে বা ঘোড়া'য়। দশমী বৃহস্পতিবার শুক্রবার হলে দেবীর গমন হবে দোলা বা পাল্কীতে। এবং দশমী বুধবার হলে দেবীর গমন নৌকায়।

দেবীর কোন বাহন কিসের প্রতীক ?

দোল বা পাল্কী ঃ দোলা হল মহামারী বা মড়কের প্রতীক।

নৌকা ঃ নৌকা হল বন্যার প্রতীক। আবার অনেকে মনে করেন নৌকায় দেবী দুর্গার আগমন হলে চারিদিকে ভাল ফসল হয়।

গজ ঃ গজ বা হাতি হল শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। গজে আগমন বা গমন হলে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হয়।

ঘোটক ঃ ঘোটক বা ঘোড়ার অর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এলোমেলো অবস্থা। যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি, বিপ্লব ইত্যাদির সংকেত।

এ বছর মা দুর্গার আগমণ হবে দোলা বা পাল্কীতে। শাস্ত্রমতে 'দোলায়াং মকরং ভবেৎ' অর্থাৎ মহামারী, ভূমিকম্প, খরা, যুদ্ধ বা অকালমৃত্যু হতে পারে। বিপুল প্রাণহাণি অনিবার্য।

দেবীর আগমন হবে ঘোটকে বা ঘোড়ায়। তার ফল হয় 'ছত্র-ভংগস্তরঙ্গমে' অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক স্তরে অস্থিরতা বিরাজ করে। এক কথায় - 'ছত্রভঙ্গম'।

মায়ের আসা-যাওয়া যেমনই হোক না কেন, ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে দুর্গাপূজো আজ রূপ নিয়েছে এক সার্বজনীন উৎসবে। দুর্গাপুজো শুধু পুজো নয়, আনন্দ, হাসি, আড্ডায় সদলবলে মেতে ওঠার উৎসব। এই শারদোৎসব এখন আর সেই গন্ডীতে বাঁধা নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সবারই উৎসব হয়ে উঠেছে আজ এই মাতৃপূজা।

বর্ষার বৃষ্টির ধোয়া নীলাকাশে সোনালী রোদ্দুরের আল্পনা, শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসে ঝরে পড়া মুঠো মুঠো শিউলি। শরতের সাদা কাশফুলে ভরা বাংলার মাঠ। প্রকৃতির এই অপূর্ব সুন্দর সাজ জানান দিচ্ছে - "মা" আসছেন।

<><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -
নতুন রূপে নতুন সাজে
হিন্দুস্থান ক্লথ স্টোর্স

যে কোন সরকারি, বেসরকারি স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুল ড্রেস, টাই, বেল্ট এর সেরা ঠিকানা।
মঙ্গলবারি বাজার, লালা,৭৮৮১৬৩, হাইলাকান্দি
প্রোঃ জমিল আহমেদ চৌধুরী, ফোন ঃ- ৭০০২৫৩০৫১৮

যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজা: প্রবাসী বাঙালিদের এক প্রাণবন্ত উদযাপন

অজয় কুমার সিংহ

শরতের আগমনে যখন পাতা সোনালী রঙে রাঙাতে শুরু করে এবং হাওয়ায় এক মিষ্টি ঠান্ডা ভাব আসে, তখন বিশ্বজুড়ে বাঙালিরা জানে যে দুর্গা পূজার উৎসব আসন্ন। যারা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের নতুন বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য দুর্গা পূজা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়; এটি আমাদের শিকড়ের একটি সংবেদনশীল স্মৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উদযাপন এবং আমাদের মাতৃভূমির সাথে সংযোগের একটি সেতু। আমাদের মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালি সম্প্রদায়গুলি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে আমাদের প্রিয় ঐতিহ্যগুলি ধরে রেখে দুর্গা পূজার জাদু পুনঃসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে: সপ্তাহান্তে দুর্গা পূজা উদযাপন

আমরা যে অনন্য পরিবর্তনটি করেছি তার মধ্যে একটি হলো সপ্তাহান্তে দুর্গা পূজা উদযাপন করা, যা ভারতে চন্দ্র পঞ্জিকার কঠোর অনুসরণের থেকে ভিন্ন। এই পরিবর্তনটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে অপরিহার্য:

কাজ এবং স্কুলের বাধ্যবাধকতা: যুক্তরাষ্ট্রে, কর্মদিবসে ছুটি নেওয়া পেশাগত এবং একাডেমিক দায়িত্বের কারণে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। অধিকাংশ কর্মস্থল এবং স্কুল দুর্গা পূজাকে ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। সাপ্তাহিক ছুটিতে উৎসবগুলি আয়োজন করে আমরা নিশ্চিত করি যে কর্মজীবী প্রাপ্তবয়স্ক থেকে স্কুলগামী শিশু পর্যন্ত সবাই তাদের দায়িত্বগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না করে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই নমনীয়তা আমাদেরকে কর্মদিবসের চাপ ছাড়াই উৎসবে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হতে দেয়।

অংশগ্রহণের সর্বাধিকতা: সাপ্তাহিক ছুটির উদযাপনগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশী শহর এবং রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদেরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। এটি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা বন্ধু এবং পরিবারের জন্য একটি মিলনস্থানে পরিণত হয়। যখন পরের দিন কাজ বা স্কুল থাকে না, তখন অনেকেই দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক হন, যা দুর্গা পূজার সাথে জড়িত সম্প্রদায় এবং একতাবোধকে বৃদ্ধি করে।

স্থানের প্রাপ্যতা: পূজার জন্য উপযুক্ত স্থানগুলি কর্মদিবসে সুরক্ষিত করা কঠিন এবং ব্যয়বহুল হতে পারে। সাপ্তাহিক ছুটিতে কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল অডিটোরিয়াম এবং ইভেন্ট হলগুলি আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী হয়। সাপ্তাহিক ছুটির বুকিংগুলি লজিস্টিক এবং আর্থিক উভয় দিক থেকেই আরও কার্যকর, যা আমাদেরকে বড় জমায়েত, মনোরম সজ্জা, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এবং খাবারের স্টল সহ উৎসবটি আয়োজনের সুযোগ দেয়।

সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তি: সাপ্তাহিক ছুটিতে পূজা করা আমাদের অ-বাঙালি বন্ধু, সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের জন্য আমাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়। এটি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি পরিবেশ তৈরি করে এবং উৎসবের পরিধি বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন পটভূমির মানুষের উপস্থিতি উদযাপনকে সমৃদ্ধ করে, বোঝাপড়া বৃদ্ধি করে এবং আমাদেরকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সাথে দুর্গা পূজার আনন্দ ভাগ করে নিতে দেয়।

এই নমনীয় পদ্ধতি আমাদের সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে, যা আমাদেরকে আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান করতে দেয় এবং একই সাথে আমাদের নতুন পরিবেশের বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনের প্রয়োজনীয়তার সাথে সংমিশ্রণ করার একটি প্রমাণ, যা নিশ্চিত করে যে দুর্গা পূজার মূল সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

লালা থেকে নিউ জার্সি: একটি ব্যক্তিগত যাত্রা

আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি ভারতের আসাম রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলার একটি ছোট শহর লালা-তে। সবুজ চা বাগান, ঢেউ খেলানো পাহাড় এবং শান্ত বারাক নদীর দ্বারা বেষ্টিত লালা ছিল একটি জায়গা যেখানে ঐতিহ্য গভীরভাবে প্রোথিত ছিল এবং সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত সংযুক্ত। লালায় দুর্গা পূজা ছিল বছরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ একটি সময় যখন পুরো শহরটি উৎসব, আনন্দ এবং একতায় পূর্ণ হয়ে উঠত।

লালার স্মৃতি

শিশু হিসাবে, দুর্গা পূজা ছিল একটি জাদুকরী সময়। উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে শিল্পীরা শহর জুড়ে চমৎকার প্যান্ডেল (অস্থায়ী কাঠামো) তৈরি করতে শুরু করতেন। প্রতিটি প্যান্ডেল ছিল একটি শিল্পকর্ম, সূক্ষ্ম নকশা, উজ্জ্বল রং এবং ঝকঝকে আলো দিয়ে সজ্জিত। আমি

আমার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কাজের অগ্রগতি দেখতে যেতাম, তাজা বাঁশ, খড় এবং ভেজা মাটির মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসতো।

সকালগুলি শুরু হতো ঢাকের তালের সাথে, যা পুরো শহরের হৃদস্পন্দনের সাথে মিশে যেত। এই শব্দটি সরু গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে সবার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করতো। নতুন পোশাক-ছেলেদের জন্য পরিষ্কার শার্ট-প্যান্ট এবং মেয়েদের জন্য রঙিন শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরে আমরা পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে প্যান্ডেল পরিদর্শন করতাম, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতাম। দেবী দুর্গার মূর্তি, কঠোর কিন্তু স্নেহময়ী, ফুল এবং অলঙ্কারে সজ্জিত, আমার কিশোর মনে একটি অবিচ্ছিন্ন ছাপ রেখে গেছে।

সম্প্রদায়ের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। রাস্তার ধারে দোকানগুলি খেলনা, বেলুন, পিস্তল থেকে শুরু করে সুস্বাদু গরম জিলাপি, রসগোল্লা এবং মুঘলাই পরোটা পর্যন্ত সবকিছু বিক্রি করতো। পুরো শহর, ব্যক্তিগত পার্থক্য সত্ত্বেও, আনন্দ এবং ভক্তির একটি সম্মিলিত অভিব্যক্তিতে একত্রিত হতো। এটি ছিল একটি সময় যখন সামাজিক বাধা দূর হয়ে যেত এবং ঐক্যের চেতনা বিজয়ী হতো।

যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর

বারো বছর আগে, যখন আমি আমার পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হলাম, প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়ায় কাজ করতাম। দুর্গা পূজা আসার সাথে সাথে, আমি ভারতে উৎসবের পরিচিত দৃশ্য এবং শব্দের জন্য আকুল হয়ে উঠলাম। ব্যস্ত রাস্তা, সজ্জিত প্যান্ডেল, সমবেত প্রার্থনা-সবকিছুই মনে হতো যেন অনেক দূরে।

আমার আনন্দের সাথে, আমি আবিষ্কার করলাম যে ক্যালিফোর্নিয়ার বাঙালি সম্প্রদায় দুর্গা পূজা উদযাপন করে, এবং আমরা সপ্তাহান্তে গাড়িতে করে দুটি প্যান্ডেলে গিয়েছিলাম। তারা একে অপরের থেকে অনেক দূরে ছিল, এবং ড্রাইভগুলি ছিল দীর্ঘ, কিন্তু অভিজ্ঞতাটি ছিল হৃদয়স্পর্শী। উদযাপনগুলি, যদিও ছোট স্কেলের, একই উৎসাহ এবং ভক্তি বহন করতো। পরিচিত আচার-অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হতে দেখে এবং আমার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া অন্যদের সাথে দেখা করে স্বস্তি পেয়েছিলাম।

তবে, নিউ জার্সি-তে স্থানান্তরিত হওয়ার পর আমি সত্যিকারের পুনরায় সংযুক্ত হলাম আমার শৈশবের মতো দুর্গা পূজার সাথে। নিউ জার্সির বাঙালি সম্প্রদায় ছিল সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত। আনন্দ মন্দির, গার্ডেন স্টেট পূজা কমিটি, এবং কল্লোল এর মতো সংগঠনগুলি শুধু দুর্গা পূজা উদযাপন করছিল না, বরং অসাধারণ প্রামাণিকতা এবং উৎসাহের সাথে তা করছিল।

নিউ জার্সিতে দুর্গা পূজার অভিজ্ঞতা

নিউ জার্সিতে আমাদের প্রথম দুর্গা পূজা ছিল একটি চোখ খোলা। উৎসবটি সাপ্তাহিক ছুটিতে নির্ধারিত হয়েছিল যাতে সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, যা আমি গভীরভাবে প্রশংসা করতে শুরু করলাম। স্থানে প্রবেশ করে আমি পরিচিত ধূপের গন্ধ, কলকাতা থেকে আমদানি করা ঐতিহ্যবাহী শৈলীতে নির্মিত সুন্দরভাবে সজ্জিত দেবী দুর্গার মূর্তি এবং পটভূমিতে ধীরগতির ভক্তিমূলক গান শুনে অভিভূত হলাম।

আচারগুলি ভারতে যেভাবে স্মরণ করতাম সেভাবে শ্রদ্ধা এবং যত্নের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল। পুরোহিতরা, ঐতিহ্যবাহী ধুতি-কুর্তা পরিহিত, সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষায় পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে পুষ্পাঞ্জলি এবং আরতি-তে অংশগ্রহণ করছিল, প্রার্থনায় হাত জোড় করে, চোখ বন্ধ করে ভক্তিতে নিমগ্ন। ধুনুচি নাচ-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশনা আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমরা আমাদের ঘরের একটি অংশ সাগর পার করে নিয়ে এসেছি।

যা আমাকে সত্যিই স্পর্শ করেছিল তা হলো সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা। ইংরেজি ভাষাভাষী যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাঙালি শিশুরা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, বাংলা গান এবং নাচ পরিবেশন করেছিল যা তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করেছিল। তারা দেবীকে স্বাগত জানিয়ে আগমনী গান শিখেছিল এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নৃত্য পরিবেশন করেছিল। তাদের চোখে গর্ব এবং দর্শকদের করতালি আমাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।

উৎসবটি বিভিন্ন জীবনধারার মানুষের সাথে দেখা করার সুযোগও দিয়েছিল-কেউ কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, আবার কেউ ছিলেন নতুন অভিবাসী। গল্প শেয়ার করা, আমাদের জন্মস্থানগুলি নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করা এবং আমেরিকার জীবনে কিভাবে মানিয়ে নিয়েছি তা নিয়ে আলোচনা করা এক ধরনের বন্ধুত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল। যেখানে আমরা সবাই ভোগ ভাগ করে নিচ্ছিলাম সেই সমবায় ভোজন এলাকা আমাকে প্যান্ডেল হপিং এবং প্রতিটি প্যান্ডেল থেকে চরণামৃত এবং প্রসাদ নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উদযাপন

যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজার শিকড় ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে, যখন শিক্ষাগত এবং পেশাগত সুযোগের সন্ধানে বাঙালি অভিবাসীদের উল্লেখযোগ্য আগমন ঘটেছিল। গৃহাতুর কিন্তু দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, এই পথপ্রদর্শকরা প্রথম পূজাগুলি স্থাপন করেছিলেন সাধারণ পরিবেশে-বাসার ঘর, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল এবং ছোট কমিউনিটি সেন্টার। যা ঘনিষ্ঠ সমাবেশ হিসাবে শুরু হয়েছিল তা এখন বেড়ে উঠেছে বড় ইভেন্টে, যা ক্রমবর্ধমান বাঙালি জনসংখ্যা এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভব হয়েছে।

যদিও আমার অভিজ্ঞতা প্রধানত নিউ জার্সিতে কেন্দ্রীভূত, যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাঙালি সম্প্রদায়গুলিতে অনুরূপ গল্পগুলি প্রকাশিত হয়।

পূর্ব উপকূলের প্রতিধ্বনি: নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সিতে উদযাপন

পূর্ব উপকূল, যা উল্লেখযোগ্য বাঙালি জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল, সবচেয়ে বড় দুর্গা পূজার উৎসবগুলির মধ্যে কয়েকটি

আয়োজন করে।

নিউ ইয়র্ক: টাইমস স্কোয়ার দুর্গা পূজা এবং বাংলাদেশ পূজা সমিতি অফ নিউ ইয়র্ক কয়েক দশক ধরে দুর্গা পূজা আয়োজন করে আসছে। স্কুল অডিটোরিয়াম বা কমিউনিটি হলের মতো প্রশস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত এই উদযাপনগুলি প্রতিবেশী রাজ্য থেকে উপস্থিতিদের আকর্ষণ করে। মূর্তিগুলি প্রায়ই কলকাতা থেকে আমদানি করা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়, এবং আচারগুলি বাংলার মতোই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলি স্থানীয় প্রতিভা এবং ভারতের অতিথি শিল্পীদের মিশ্রণ প্রদর্শন করে, যা শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে সমসাময়িক থিয়েটার পর্যন্ত পরিবেশনা উপস্থাপন করে। বাঙালি খাদ্যের স্টলগুলি উৎসবের পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে।

নিউ জার্সি: উজ্জ্বল বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য পরিচিত, নিউ জার্সির উদযাপনগুলি আনন্দ মন্দির, গার্ডেন স্টেট পূজা কমিটি, এবং কল্লোল এর মতো সংগঠনগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সংগঠনগুলি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে সব বয়সের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুতিতে অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আনন্দ মন্দির শুধুমাত্র একটি স্থান নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে পূজার আচারগুলি অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পন্ন হয়। পরিবেশ ধূপের সুগন্ধ, ঢাকের প্রতিধ্বনি এবং মন্ত্রের সম্মিলিত জপে সমৃদ্ধ হয়। ঐক্য এবং যৌথ উদ্দেশ্যের অনুভূতি স্পষ্ট।

দক্ষিণের সফর: জর্জিয়া এবং টেক্সাসে উদযাপন

দক্ষিণের রাজ্যগুলি, যদিও ভৌগোলিকভাবে বঙ্গ থেকে দূরে, দুর্গা পূজার একই উৎসবমুখর আত্মায় প্রতিফলিত হয়।

জর্জিয়া: আটলান্টায়, বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেটার আটলান্টা (BAGA) অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুর্গা পূজার ইভেন্ট আয়োজন করে। যা BAGA-কে আলাদা করে তোলে তা হলো অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষার উপর জোর। পূজাটি বহু দিনের মধ্যে বিস্তৃত হয়, যেখানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং সেমিনার অন্তর্ভুক্ত। যুবকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, বিতর্ক, কুইজ এবং বাঙালি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে পরিবেশনা করে। সম্প্রদায়টি দাতব্য কর্মকাণ্ডেও যুক্ত থাকে, যা উৎসবের সাথে সম্পর্কিত দানের চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

টেক্সাস: হিউস্টন এবং ডালাসের মতো শহরগুলি বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখেছে, যার ফলে বড় উদযাপন হয়েছে। হিউস্টন দুর্গাবাড়ি সোসাইটি সাহিত্যিক এবং শিল্পী প্রকাশের উপর ফোকাস করে দুর্গা পূজা আয়োজন করে। স্থানীয় বাঙালি শিল্পীদের কাজ প্রদর্শনকারী শিল্প প্রদর্শনী একটি হাইলাইট, যা সৃজনশীল প্রকাশ এবং প্রশংসার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলিতে বাংলার লোকসংস্কৃতি প্রদর্শনকারী সঙ্গীতের পরিবেশনা অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম উপকূলের বিস্ময়: ক্যালিফোর্নিয়া এবং ওয়াশিংটনে উদযাপন

পশ্চিম উপকূলে, বাঙালি সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজস্ব স্বাদ যোগ করেছে দুর্গা পূজার উদযাপনে।

ক্যালিফোর্নিয়া: লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায়, দক্ষিণী বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যালিফোর্নিয়া বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের একটি ভিত্তি। তাদের দুর্গা পূজা বিখ্যাত তাদের বিস্তৃত মঞ্চ প্রযোজনা-সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য এবং নাটক। সম্প্রদায়টি টেকসইতার উপর জোর দেয়, সজ্জার জন্য জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহার এবং বর্জ্য হ্রাসের মতো পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করে। ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, রান্না এবং সঙ্গীতের উপর কর্মশালা সংগঠিত করা হয়, যা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করে। এছাড়াও ভ্যালি বাঙালি কমিউনিটি, সনাতন বাঙালি সোসাইটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া ইত্যাদি অনেকগুলি দুর্গা পূজা উদযাপন করে।

ওয়াশিংটন: মৈত্রী - বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেটার সিয়াটল প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিম জুড়ে বাঙালিদের একত্রিত করে। তাদের উদযাপনগুলি ঐতিহ্যবাহী আচার এবং আধুনিক সংবেদনশীলতার মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত। পূজায় এমন ইন্টারেক্টিভ সেশন অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে প্রবীণরা বাংলায় তাদের অভিজ্ঞতার গল্প এবং উপাখ্যান শেয়ার করে, আন্তঃপ্রজন্মের সংযোগকে উৎসাহিত করে। সম্প্রদায়টি সামাজিক দায়িত্বকেও গুরুত্ব দেয়, উৎসবের সময় খাদ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশগত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে।

মধ্য-পশ্চিমের মেলোডি: ইলিনয় এবং ওহাইওতে উদযাপন

মধ্য-পশ্চিম, যার নিজস্ব বাঙালি অভিবাসীদের পকেট রয়েছে, দুর্গা পূজার উদযাপনগুলিতে অবদান রাখে।

ইলিনয়: শিকাগোর বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেটার শিকাগো দুর্গা পূজার সময় একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। আচারগুলি কঠোরভাবে ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্র অনুসারে সম্পন্ন হয়, এবং মন্দিরের পরিবেশ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অনুভূতি উদ্রেক করে। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলিতে প্রায়ই হিন্দুস্তানি এবং কর্ণাটক ঐতিহ্যের স্বীকৃত শিল্পীদের দ্বারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কনসার্ট অন্তর্ভুক্ত থাকে। সম্প্রদায়টি সমবায় ভোজের জন্য একত্রিত হয়, যা বন্ধুত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করে।

ওহাইও: কলম্বাস এবং সিনসিনাটির মতো শহরগুলিতে, সিনসিনাটি কালচারাল ইনিশিয়েটিভ এবং বাঙালি কালচারাল সোসাইটি অফ ক্লিভল্যান্ড এর মতো ছোট কিন্তু উৎসাহী সম্প্রদায়গুলি দুর্গা পূজার জন্য একত্রিত হয়। এই উদযাপনগুলি অন্তরঙ্গ, যেখানে পরিবারগুলি ভোগ রান্না থেকে শুরু করে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য শিশুদের শেখানো পর্যন্ত দায়িত্বগুলি ভাগ করে নেয়। এই সমাবেশগুলির সরলতা উৎসবের মূল-ভক্তি, ঐক্য এবং আনন্দকে হাইলাইট করে।

অভিযোজনের গুরুত্ব

সপ্তাহান্তে দুর্গা পূজা উদযাপন করা শুধু সুবিধার বিষয় নয়; এটি আমাদের ঐতিহ্যকে নতুন প্রেক্ষাপটে টিকিয়ে রাখার একটি কৌশলগত অভিযোজন।

সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা: নমনীয় সময়সূচী নিশ্চিত করে যে আমাদের

প্রথাগুলি সংরক্ষিত এবং প্রেরিত হয়, এমনকি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সময়গত পরিবেশের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও। এটি আমাদেরকে আমাদের আচারগুলির অখণ্ডতা বজায় রাখতে দেয়, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি মেনে চলে।

সম্প্রদায়ের শক্তি: অংশগ্রহণ সর্বাধিক করে আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক বন্ধনকে শক্তিশালী করি। উৎসবটি সামাজিক যোগাযোগ, পারস্পরিক সমর্থন এবং আমাদের সমষ্টিগত পরিচয়ের পুনর্বলনের জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এটি একটি অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি প্রচার করে এবং একটি সমর্থন নেটওয়ার্ক প্রদান করে যা বিদেশে অমূল্য।

শিক্ষাগত সুযোগ: সাপ্তাহিক ছুটির উদযাপনগুলি কর্মশালা, সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় যা উভয় সম্প্রদায় এবং বাইরের লোকদের বাঙালি ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে তরুণ প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য বুঝতে এবং মূল্যায়ন করে।

সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এবং কর্মকাণ্ড

দুর্গা পূজার হৃদয় শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নয়, বরং তার সাথে যুক্ত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতেও নিহিত।

পরিবেশনা: অধিকাংশ দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটি পূজার দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক/সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করে। বলিউড এবং বাংলা গায়ক/শিল্পীদের প্রায়ই ভারত থেকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই ইভেন্টগুলির টিকেট প্রায়ই উচ্চ মূল্যের হয়, একজনের জন্য ২০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

যুবসম্পৃক্ততা: শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গানে অংশগ্রহণ করে, আবৃত্তি এবং নাটকে অংশ নেয় যা তাদের মধ্যে গর্ব এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রতিভা প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা তাদেরকে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রদর্শনের জন্য উৎসাহ দেয়।

কর্মশালা এবং প্রদর্শনী: অনেক সম্প্রদায় হস্তশিল্প কর্মশালা, ভাষা ক্লাস এবং বাঙালি সাহিত্য ও সিনেমার প্রদর্শনী সংগঠিত করে। এই কর্মকাণ্ডগুলি শিক্ষামূলক এবং সংরক্ষণমূলক উভয় উদ্দেশ্যই পরিবেশন করে, আমাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলিকে জীবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক রাখে।

রান্নার আনন্দ

খাবার আমাদের উদযাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং আমরা বাড়ির স্বাদগুলি পুনরায় সৃষ্টিতে কোন প্রচেষ্টাই বাদ দেই না।

ভোগ প্রস্তুতি: একটি সমবায় রান্নাঘর প্রায়ই স্থাপন করা হয় যেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা ভোগ প্রস্তুত করেন। মেনুতে ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন খিচুড়ি (চাল এবং ডালের খিচুড়ি), লাবরা (মিশ্র সবজি কারি), বেগুনি (বেগুন ভাজা) এবং মিষ্টান্ন যেমন পায়েস (দুধের পায়েস) অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভোগের প্রস্তুতি এবং ভাগাভাগি ঐক্য এবং সমতার প্রতীক।

খাবারের স্টল: উৎসবগুলিতে রাস্তার ধারের বাঙালি খাবার এবং ফুচকা, ঝালমুড়ি, কাঠি রোল এবং রসগোল্লা, সন্দেশ এর মতো মিষ্টান্ন বিক্রি করা স্টল থাকে। এটি একটি রন্ধনযাত্রা যা ইন্দ্রিয়গুলি আনন্দিত করে এবং লোকজনকে ভাগাভাগি খাবারের মাধ্যমে একত্রিত করে। খাবার আমাদের দেশে রাস্তার ধারের দোকান এবং মিষ্টির দোকানের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্য

বিদেশের মাটিতে দুর্গা পূজা আয়োজনের বিশেষ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু বাঙালি সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা তা উজ্জ্বল করে তোলে।

লজিস্টিক বাধা: স্থানের নিরাপত্তা, বিশেষ করে বড়গুলির, উচ্চ খরচ এবং প্রাপ্যতার কারণে কঠিন হতে পারে। সম্প্রদায়গুলি প্রায়ই মাস আগেই স্থানগুলি বুক করে এবং ব্যয় মেটাতে তহবিল সংগ্রহের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে। মূর্তি এবং উপকরণ পরিবহন, বিক্রেতাদের সাথে সমন্বয় করা এবং সময়সূচী পরিচালনা করা সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা: একটি বড় স্বেচ্ছাসেবক দলের সমন্বয় কার্যকর নেতৃত্ব প্রয়োজন। কমিটিগুলি কার্যকরভাবে কাজগুলি বিতরণ করতে কাঠামোবদ্ধ হয়, সহযোগিতার মনোভাব প্রচার করে। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনকে সামলিয়ে সময় এবং দক্ষতা অবদান রাখে।

সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা: সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলি নেভিগেট করা এবং নিশ্চিত করা যে উদযাপনগুলি স্থানীয় আইন এবং সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মানজনক তা গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে নিরাপত্তা বিধি, শব্দ নিয়ম এবং সম্প্রদায়ের নির্দেশিকা মেনে চলা অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সম্প্রদায়ের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করা পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধি করে।

আবেগময় প্রতিধ্বনি: স্মৃতি এবং পরিচয়ের উৎসব

বাঙালি অভিবাসীদের জন্য, দুর্গা পূজা শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়; এটি একটি আবেগময় নোঙর।

নস্টালজিয়া এবং সংযোগ: পূজার দৃশ্য, শব্দ এবং সুগন্ধ শৈশব এবং মাতৃভূমির স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। এই নস্টালজিয়া সাম্প্রদায়িক বন্ধনকে শক্তিশালী করে, কারণ ভাগ করা অভিজ্ঞতাগুলি অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটি গৃহাতুরতা হ্রাস করে এবং আমাদের শিকড়ের সাথে সংযোগ পুনর্ব্যক্ত করে।

পরিচয় সংরক্ষণ: উৎসবটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ের পুনর্বিবেচনা করে। এটি এমন একটি স্থান প্রদান করে যেখানে ঐতিহ্যগুলি কেবলমাত্র সংরক্ষিত নয় বরং খোলা ভাবে উদযাপিত হয়, যা অভিবাসী এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে একটি ইতিবাচক স্ব-চিত্রকে পুনর্বলিত করে। এটি আমাদেরকে গর্বের সাথে আমাদের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে সক্ষম করে।

সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং সামাজিক উদ্যোগ

দুর্গা পূজার উদযাপনগুলি প্রায়ই উৎসবের বাইরে প্রসারিত হয়, যা সামাজিক

দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দাতব্য প্রচেষ্টা: অনেক সংগঠন দাতব্য উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এই উৎসবটি ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দুর্যোগ সহায়তার জন্য অবদান রাখা হয়। রক্তদান শিবির, খাদ্য সংগ্রহ এবং দরিদ্র সম্প্রদায়গুলির সহায়তা উৎসবের পরোপকারী আত্মাকে প্রতিফলিত করে।

সাংস্কৃতিক বিনিময়: তাদের উদযাপনগুলি বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে, বাঙালি সম্প্রদায়গুলি সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া প্রচার করে। অ-বাঙালি উপস্থিতিরা ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি অনুভব করে, যা প্রশংসা এবং সম্মানকে উৎসাহিত করে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদযাপিত হয়, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু নির্মাণ করা হয়।

নেটওয়ার্কিং সুযোগ: এই সমাবেশগুলি পেশাজীবী, উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং সহজতর করে। যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের সাথে মানিয়ে নেওয়া নতুনদের জন্য এই সমর্থন নেটওয়ার্কটি অমূল্য হতে পারে। অভিজ্ঞতা এবং সম্পদ ভাগ করে নেওয়া সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে।

ব্যক্তিগত গল্প: প্রবাসের কাহিনী

দুর্গা পূজার বৃহৎ চিত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত গল্পগুলি যা উৎসবের তাৎপর্যকে হাইলাইট করে।

একজন তরুণ পেশাজীবীর অংশগ্রহণ: ধরুন অনন্যা, নিউ ইয়র্কের একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। একটি চাহিদাপূর্ণ চাকরি সামলে তিনি দুর্গা পূজার সাংস্কৃতিক সমন্বয়কারী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক হন। তার জন্য এটি তার শিকড়ের সাথে সংযুক্ত থাকার এবং সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেওয়ার একটি উপায়। তিনি বলেন, "নৃত্য পরিবেশনা সংগঠিত করা আমাকে শিলচরের স্কুল জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে বাচ্চারা একই ঐতিহ্য গ্রহণ করছে দেখে হৃদয় উষ্ণ হয়।"

একটি পরিবারের পুনর্মিলন: ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসের মুখার্জি পরিবারের জন্য, দুর্গা পূজা বার্ষিক পারিবারিক পুনর্মিলন। আত্মীয়রা বিভিন্ন রাজ্য থেকে উড়ে আসে, উৎসবটি পারিবারিক বন্ধনের এক সপ্তাহব্যাপী উদযাপনে পরিণত হয়। মিসেস মুখার্জি বলেন, "এটাই সময় যখন আমাদের সন্তানরা তাদের কাজিনদের সাথে পুনরায় সংযোগ করে এবং আমাদের রীতিনীতি সম্পর্কে শেখে। আমরা একসাথে রান্না করি, প্রার্থনা করি এবং উদযাপন করি।"

যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজার ভবিষ্যৎ

বাঙালি প্রবাসীরা যেমন বৃদ্ধি এবং বিকাশ অব্যাহত রাখছে, তেমনি দুর্গা পূজার উদযাপনও।

যুব নেতৃত্ব: সংগঠনের কমিটিগুলিতে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব গ্রহণের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন রয়েছে। তাদের তাজা দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উৎসবগুলিতে নতুন মাত্রা যোগ করছে। ডিজিটাল মার্কেটিং, অনলাইন নিবন্ধন এবং ভার্চুয়াল ইভেন্টগুলি পূজার পরিধি বাড়াচ্ছে।

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ: মূল ঐতিহ্যগুলি বজায় রেখে অন্যান্য সংস্কৃতির উপাদানগুলি সংযোজিত করার একটি উন্মুক্ততা রয়েছে। ফিউশন সঙ্গীত পরিবেশনা, সহযোগিতামূলক শিল্প প্রকল্প এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইভেন্টগুলি সম্প্রদায়ের গতিশীল প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। এই সংমিশ্রণ উৎসবকে সমৃদ্ধ করে এবং এটি বৃহত্তর দর্শকদের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

বিশ্বব্যাপী সংযোগ: সামাজিক মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবহার দুর্গা পূজার উদযাপনগুলির পরিধি বাড়িয়েছে। সম্প্রদায়গুলি অনলাইনে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, বিশ্বজুড়ে বাঙালিদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং একটি বিশ্বব্যাপী ঐক্যের অনুভূতি তৈরি করে। আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের লাইভ স্ট্রিমিং বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়।

উপসংহার

যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজা সাংস্কৃতিক স্থিতিস্থাপকতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার একটি চমৎকার উদাহরণ। বাঙালি অভিবাসীরা শুধু একটি উৎসব রোপণ করেনি, বরং নতুন মাটিতে তা লালন-পালন করেছে, যা তাদের নিজেদের এবং তাদের প্রতিবেশীদের জীবন সমৃদ্ধ করেছে। আচার-অনুষ্ঠানের সুচারু সংরক্ষণ, উৎসাহী সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তরিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করে যে ঢাকের বীট এবং মহালয়ার আত্মা আমেরিকান প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। উৎসবটি মানবিক আকাঙ্ক্ষার একটি প্রমাণ যে আমরা নতুন দিগন্তকে গ্রহণ করার সময়ও আমাদের পরিচয় বজায় রাখতে চাই। এটি মন্দের উপর ভালোর বিজয় উদযাপন করে, শুধু পৌরাণিক কাহিনিতে নয়, বরং বিদেশে ঘর গড়ে তোলার অভিবাসীদের প্রতিদিনের বিজয়গুলিতেও। যখন শিউলি ফুলের গন্ধ নিউ ইয়র্ক থেকে সান ফ্রান্সিসকোর শহরগুলির খাস্তা শরতের বাতাসের সাথে মিশে যায়, তখন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্গা পূজা বাঙালি প্রবাসীদের অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ এবং উন্নত করতে থাকে।

সম্প্রদায়ের প্রতিফলন

নিউ ইয়র্কের একজন সম্প্রদায় প্রবীণ ড. এস. রায় এর কথায়: "দুর্গা পূজা আমাদেরকে একত্রিত করে রাখার সুতোর মতো। এটি আমাদেরকে কোথা থেকে এসেছি তা মনে করিয়ে দেয় এবং আমাদের সন্তানদের আমাদের ঐতিহ্যের সৌন্দর্য দেখায়। আমরা বঙ্গ থেকে মাইল দূরে থাকলেও, এই দিনগুলিতে আমাদের হৃদয় বাড়িতেই থাকে।"

আর রিয়া, প্রিন্সটন, নিউ জার্সির একজন দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি-আমেরিকান, যথার্থভাবে বলেন: "দুর্গা পূজায় অংশগ্রহণ করা আমাকে আমার সেই অংশের সাথে সংযুক্ত করে যা আমি প্রতিদিন অনুভব করি না। এটি আমার পরিচয়কে উদযাপন করতে এবং বিভিন্ন পটভূমির আমার বন্ধুদের সাথে তা ভাগ করে নিতে আমাকে ক্ষমতায়িত করে।"

<><><><><>

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

যাদুর দেশ মায়ং

সপ্তমিতা নাথ

লোকিক অলৌকিকের ঘেরাটোপে বেষ্টিত জন জীবন প্রকৃত পক্ষে সভ্যতাকে আধুনিকতার দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সম্পূর্ণ লৌকিকতা বা অন্যভাবে বাস্তবতাকে নিয়ে জীবনে এগোনো যেমন নিরস নারিকেলের উপরিভাগ। তেমনি বাস্তবতাকে সাথে সঙ্গী করে কিছুটা অলৌকিকতার উপর আস্থা বা বিশ্বাস রেখেই সম্ভব নিরস খোসা ছাড়িয়ে নারিকেলের ভেতরে রসালো সার বা জল পাওয়া। প্রতিনিয়ত অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব ঘটানো ঘটছে আর আজও চারিপাশে। আবার সম্পূর্ণ ও অলোকিক বা মিরাকেলের উপর নির্ভরতা স্তব্ধ করে ফেলবে মানব সমাজকে পিছিয়ে নেবে শতাব্দী প্রাচীনে।

পুরাতন নওগাঁ জেলা এবং বর্তমান মরিগাঁও জেলার পশ্চিমে অবস্থিত মায়ং। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বেষ্টনী, চারিদিকে সবুজ পাহাড় গাছপালা যেন মায়াময়। এরকম শান্তিময় পরিবেশ যেকোন সাধনার জন্য খুবই উপযোগী তা বলা বাহুল্য। সাধনার জন্য চাই শান্ত নির্মল পরিবেশ এবং এখান থেকেই মায়াময় কাহিনীর সূত্রপাত সম্ভবত মায়ং ও মায়ং এর তন্ত্র-মন্ত্র জাদু।

তবে কি আছে মায়ং এ তন্ত্র নাকি জাদু নাকি মন্ত্র? জাদু আসলে কি। কিবা সেই তন্ত্র মন্ত্র! কিভাবে প্রয়োগ হয়। কি ফল হয় তাতে! কতটুকু ভীতিকর ? প্রথমে জেনে নেই জাদুমন্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র কি একই নাকি সেখানে রয়েছে প্রকারভেদ। প্রথমে জেনে নেই জাদু ও মন্ত্রের মধ্যে কি পার্থক্য, একজন বিশিষ্ট পন্ডিত তার মন্তব্যে বলেন

Magic in the opinion of the leading anthropologists must necessarily be false and barren , for were it ever to become true and fruitful ,it would no longer be magic but science. Magic on analysis resolves itself into a mistaken application of the laws of

association of the ideas by similarity and contiganity. Legitimately applied these some principles yeild science and illegitimately applied, they yeild magic.

এক খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদের মধ্যে যাদু মিথ্যা এবং নিষ্ফল। যদি সত্যি ও ফলপ্রসূ হয় তবে তা যাদু নয় বরং বিজ্ঞান হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যাদু হচ্ছে সাদৃশ্য এবং সংলগ্নতার উপরে ভিত্তি করে ভাব সংযোগ নীতির এক ভুল প্রয়োগ। এই নীতিগুলোকে আইনগতভাবে বা শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করলে আমাদের জ্ঞান দেয়।

এখানে এটা স্পষ্ট যে জাদু কখনো বিজ্ঞান নয় কিন্তু বিজ্ঞান থেকে জাদু খুব বেশি আলাদা নয়।জাদু মানে সভ্যতার প্রাচীনতম অন্ধবিশ্বাস এবং এই অন্ধবিশ্বাস থেকেই ধীরে ধীরে প্রণালী শুদ্ধভাবে ধীরে ধীরে যুক্তি খুঁজে ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রসারতা লাভ করেছে। দার্শনিক বাট্রেণ্ড রাসেল এই সম্পর্কে বলেছিলেন যে,

"Interest in practical use of science came first through superstitions and magic ."

এখানে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে সভ্যতার শুরু থেকে চলে আসা জাদুবিদ্যার চর্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও তা বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এবারে তবে তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে একটু এগিয়ে যাই। ভারতীয় দর্শন মতে শব্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দই নিরন্তন সত্য যার কোন বিনাশ নাই। বায়ু জল অগ্নির যেভাবে কোন বিনাশ নাই শব্দের ও কোন বিনাশ নাই। শব্দের এই অবিনাশী গুণের জন্য বলা হয় কখন কোন কুচিন্তা কুকথা না বলার জন্য।এই ধরণের চিন্তা থেকে আমরা সাধারণত নেগেটিভ বলে থাকি বা উচ্চারণ করে থাকি। আরো প্রচলিত কথা হিসাবে বলা হয় যে দশ দিকের এক একজন করে অধিষ্ঠাতা ভগবান বিরাজ করেন এবং তারা নাকি সর্বদা সর্বদিকে ঘোরাফেরা করেন এবং এবং দর্শনশাস্ত্রমতে দিনে কিছু মুহূর্ত ব্রহ্ম মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত

হয়। কোন কথা সে ভালো কথা বা খারাপ কথা সেই সময় যদি কেউ বলে তাহলে এই ঘুরতে থাকা দেব-দেবীরা তথাস্তু বললে সেই ব্রহ্ম মুহূর্তে তাই ফলপ্রসূ হয়ে যায়।তাই বলা হয় সব সময় সুচিন্তা করে সৎ কথা বলতে যাতে অভ্যাসবশত কখনো কু কথা বা নিগেটিভ কথা বের না হয় মুখ থেকে। আসল কথা হচ্ছে একটা শব্দ বারবার উচ্চারণ করলে বাহিরে গিয়ে আবার কণ্ঠে এসে স্থির হয়ে বসে যায় এবং একেই আমরা মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বলি। আজকে বিশ্বায়নের যুগে অর্থাৎ বিজ্ঞানের যুগেও এই তথ্য বারবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যেমন মোবাইলের গুগল এসিস্টেন্ট রেডিও টেলিভিশন এগুলো সব শব্দ তরঙ্গ চলমান এই শব্দসমষ্টি বা মন্ত্র সমূহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে তার ফল নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ চুর চুরি করে চলে গেলে আমরা গালি দিই এবং বারবার দেওয়া গালির ফলে আর তার ক্ষতি সাধন হয়। যা বলা হয় কুকর্মের শাস্তি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপে গুগল এসিস্ট্যান্ট স্যারের কাছে গিয়ে ফুল বললে ফুলই দেখায় মানুষ বা যন্ত্র দেখায় না।

মন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তন্ত্রের প্রয়োজন হয় তন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্র ব্যবহার করতে আবশ্যক কিছু বস্তু। সেই বস্তু সমুহ দিন-রাতি, তিথি, নক্ষত্র দিয়ে ইত্যাদি দেখে বেছে নেওয়া হয়। শাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করতে দেখা যায়। প্রাচীনকালে উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা না থাকায় মানুষ মন্ত্রকে কাজে লাগায় এবং বিভিন্ন তন্ত্র অর্থাৎ গাছ-গাছালি জড়ি বুটি ঔষধ যা তন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অতীতে মায়ং এ খুব জঙ্গল থাকার দরুন সাপ ও বিষাক্ত পোকা কামড়ের ঘটনা অহরহ সামনে আসতো এবং এই সব থেকে বাঁচার জন্য মানুষ এগুলোর প্রয়োগ করতো।সাপে কামড়ালে মা মনসা দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করতো ঠিক সেভাবে আরো বিভিন্ন কারনে মা কামাখ্যা মা কালী ও বিষ্ণু ইত্যাদি দেবদেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করতেন এবং পুরাতন বহু সূত্রে এই মন্ত্রগুলোতে ওই সকল দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় ।এখানে কোন ভূত-প্রেত ডাকিনি-যোগিনীর উল্লেখ নাই বরং ভূত প্রেত এর ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হয় ও দেব দেবীর আহবান করা হয়।

মানুষ মঙ্গল কাজের জন্য দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে। আর যখন কার্যসিদ্ধি হয় না তখন বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তার মধ্যে একটি হলো বলি প্রথা। শক্তি পূজাতে বলীর বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচনায় যে তথ্য উঠে আসলো তা আশ্চর্যজনক। খুব অতীতের কথা কেউ তুলে ধরতে পারেননি এবং কোথায় উল্লেখও নাই। তা মোটামুটি ৮০/ ৯০ দশক থেকে প্রচলন যে এখানকার মানুষরা বলি প্রথাকে অন্ধবিশ্বাস বলে মনে করেন। এই বিশ্বাস কখন কিভাবে এসেছে তার সঠিক ধারণা নেই। শক্তি পূজা ও দুর্গা পূজাতে বলির রীতি রয়েছে, তাই হয়তো দেবী শক্তি অর্থাৎ মা দুর্গার পূজা না করে এখানকার মানুষ চার পাঁচ দিন ধরে লক্ষ্মী পূজা করে ।লক্ষী পূজাকে কেন্দ্র করে এখানে মেলা ইত্যাদি বসে। অন্যান্য স্থানে দুর্গাপূজার সমরূপ।

আজকের বিজ্ঞানের যুগে মানুষ তন্ত্র মন্ত্রে নয় বরং যুক্তিতে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্রম বিবর্তনে মানুষ কোটি কোটি বছরে এগিয়ে এসেছে। মনও বুদ্ধির বিকাশকেই জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয়। মানুষ আজকাল দেখে, শুনে, অনুভব করে জ্ঞান আহরণ করে। বিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান, কিন্তু তন্ত্র মন্ত্র হচ্ছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে উপলব্ধ অভিজ্ঞতা।মায়ং এ প্রচুর মন্ত্রের অবশিষ্টাংশ ও পুঁথি রয়েছে সংগ্রহশালায়, পরবর্তী ধারাতে অবশ্যই বিশ্লেষনের ইচ্ছে আছে।তবু একটা না বললে নয় যে "বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলে তর্কে বহুদূর" আর এই বিশ্বাস ই কিন্তু কিছু অসম্ভব কাজকে আজও সম্ভবপর করে তুলেছে ......।।

সূত্র:- আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ ও ইন্দ্রজাল (স্মৃতি গ্রন্থ)

<><><><>

ANITA FENCING

Lala Bazar, P.K. Road, W/No- 3, (Thangal Road)

Contact : 8822836775

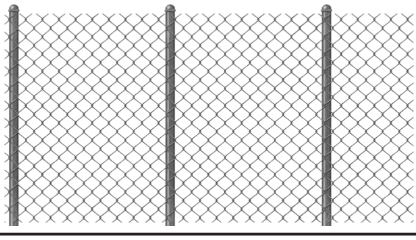

ব্ল্যাক ম্যাজিক আসামের মায়ং গ্রাম

স্বপ্না সিং

মায়ং ভারতের আসামের মরিগাঁও জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। মায়ং গ্রামটি 'ভারতের ব্ল্যাক ম্যাজিক ক্যাপিটাল' হিসাবেও পরিচিত। এই গ্রামীণ স্থানটির ইতিহাস বেশ অন্ধকার এবং ভুতুড়ে। মায়ং নামের উৎপত্তি অনেক গল্প এবং সূত্রে পাওয়া যায়, যদিও এটি কতটা সত্য তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কিছু লোক বলে যে এটি সংস্কৃত শব্দ মায়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ 'ভ্রম', অন্যরা বিশ্বাস করে যে এটি মিয়ং শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ ডিমাসা ভাষায় হাতি। পৌরাণিক মহাকাব্য মহাভারতেও মায়ং-এর উল্লেখ রয়েছে। ঘটোৎকচ মায়ং থেকে অনেক জাদুকরী শক্তি পেয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে যে অনেক পুরানো সাধু এবং কালো জাদু চর্চাকারী ডাইনি এখনও মায়ং-এর বনে যান। গ্রামের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা শুধু কালো জাদুই জানে না, চর্চাও করে। স্থানীয় মানুষ তালুর রেখা পড়ার শিল্প জানে। এখানে

কিছু লোক ভাগ্য বলার অভ্যাসও করে এবং খোলস এবং ভাঙা কাঁচের টুকরো ব্যবহার করে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করার দাবি করে। এমনকি তারা ওষুধ ছাড়াই কালো জাদু দিয়ে মানুষকে নিরাময় করে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, প্রজন্ম ধরে এই পরম্পরা চলে আসছে। যেকোনো ব্যথা দূর করার জন্য এখানকার মানুষজন সেই স্থানে তামার থালা চেপে ব্যথা দূর করে। তারা বলে যে ভূত তাদের এই কাজে সাহায্য করে। মায়ং এর একটি জাদুঘর, মায়ং সেন্ট্রাল মিউজিয়াম এবং একটি এম্পোরিয়াম রয়েছে, যেখানে টেপ, অস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক কিছু প্রদর্শন করা হয়। কালো জাদুর কারণে মায়ং ধীরে ধীরে একটি পর্যটন স্থানে পরিণত হচ্ছে। গ্রামটিতে প্রাচীন আয়ুর্বেদ এবং কালো জাদুর কিছু বই সহ অনেক প্রত্নবস্তু এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রয়েছে, যা মায়ং সেন্ট্রাল মিউজিয়াম এবং এম্পোরিয়ামে পাওয়া যায়। মায়ং এর পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আবাসস্থল, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি একশৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর নভেম্বর মাসে এখানে মায়ং পবিতরা উৎসব পালিত হয়।

<><><><>

রহস্যময় গ্রাম মায়ং , আগ্রহের শেষ নেই

নিশা মুখার্জি

ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের রাজ্য অসমের মায়ং গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দারা যুগের পর যুগ ধরে তন্ত্র-মন্ত্র, কালা জাদু, ঝাড়ফুঁক নিয়েই বেঁচে আছেন। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপার উন্নতির যুগেও মায়ং গ্রামের মানুষগুলো এখনও অলৌকিকতা এবং কুসংস্কারের দুনিয়ায় বাস করেন। যদিও বিজ্ঞান তথা আমাদের কাছে এগুলি কুসংস্কার কিন্তু তাঁদের কাছে অবশ্য সে সবই সংস্কার। রহস্যময় এই গ্রামকে ঘিরে শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নয় সারা বিশ্ববাসীরও আগ্রহের শেষ নেই। কথাটা শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই সত্যি যে প্রতি বছর হাজার হাজার দেশী বিদেশী পর্যটক মায়ং গ্রামের কালো জাদুর আকর্ষণে হাজির হন সেখানে। স্বচক্ষে উপলব্ধি করতে আসেন এই মায়ংগ্রামের কালো জাদুর প্রকৃতি। কালো জাদুর ভূমি নামে পরিচিত মায়ং গ্রামটি অসমের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। অসমের মরিগাঁও জেলার ছোট্টো গ্রাম এটি। গ্রামের নাম মায়ং হওয়ার পিছনে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য রয়েছে। কারও মতে 'মায়ং'

শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'মায়া' থেকে। ইতিহাস বলে এই গ্রামে মহাভারতের আমলে নাকি জাদুবিদ্যা চর্চা করতেন ভীমের ছেলে মায়া বিদ্যার সম্রাট ঘটোৎকচ। তথ্য অনুসারে ঘটোৎকচ ছিলেন মায়া বিদ্যার একচ্ছত্র সম্রাট। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ঘটোৎকচের মায়াবিদ্যার কারণেই তৎকালীন দিনে গ্রামটির নাম হয়েছিল মায়ং।এই অঞ্চলের স্থানীয় জনগণ একথা বলে থাকেন ভীম এবং হিড়িম্বার ছেলে ঘটোৎকচই ছিলেন এই প্রদেশের রাজা। তৎকালীন দিনে ঐন্দ্রজালিক ও মায়াবী রাজার অধীনে বসবাস শুরু করেন বিভিন্ন বয়সের একাধিক জাদুকর, তান্ত্রিক, মায়াবিনীরা। তাঁদের বংশধরেরাই নাকি এখানে আজ বসবাস করেন। শুধুমাত্র বসবাস করেন একথা বললে ভুল হবে তারা সেই পূর্বপুরুষের প্রথা, সেই পুরাতন পেশা আজও বজায় রেখেছেন ভালোভাবেই। গ্রামের রাস্তা ঘাটে, অরণ্যে, নদীর পাড়ে তাঁদের সকলকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তবে এ কথা ঠিক এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকদের উপরে তারা সরাসরি কোন কিছু জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেন না। একান্ত তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই তবেই তারা এর নমুনা মানুষের সামনে তুলে ধরে। তারা বেশিরভাগ সময়ে এই সমস্ত যাদুবিদ্যা ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবে বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে আধুনিক প্রজন্মের কিছু সদস্য এই প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বলেও জানা যায়।

<><><><>

রাজনীতি

চ্যালেঞ্জের মুখে রাজ্যের সংখ্যালঘু রাজনীতি, দিশাহীন মুসলিম সমাজ

জুয়েল আহমদ

অসমে সংখ্যালঘু অর্থাৎ স্পষ্ট করে বললে মুসলিমরা বর্তমানে এক জটিল রাজনৈতিক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছেন।২০১১ সালের জনগণনা মতে অসমের জনসংখ্যার প্রায় ৩৪.২২ শতাংশ মুসলিম। ২০২১ সালে জনগণনা হয়নি অন্যথায় এই পরিসংখ্যান ৪০ শতাংশে পৌঁছানো অস্বাভাবিক নয়। লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পর অসমেই অধিকতর সংখ্যায় মুসলিমদের বসবাস। কিন্তু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে রাজ্য রাজনীতিতে মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে। ২০১৬ সালে রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কেবিনেটে কোনো মুসলিম সদস্য নেই। সর্বানন্দ সোনোয়ালের মন্ত্রীসভায় যে চিত্র ছিল,হিমন্তবিশ্ব শর্মার মন্ত্রীসভায়ও একই চিত্র বিদ্যমান। শাসক গোষ্ঠীর রাজনীতি যখন দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করে আবর্তিত হয় সেই সরকারে মুসলিম মন্ত্রী, বিধায়ক না থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হচ্ছে,সমসাময়িক রাজনীতির আবহে আগামীতে অসমের মুসলিমরা কী ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন ? নাকি কঠিন বাস্তব অপেক্ষা করছে ? এর কারণ কী মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বশূন্যতা? অথবা বর্তমান মুসলিম নেতৃত্বের সুবিধাবাদী চরিত্র ? কিংবা কারণ যাই হোক না কেন তা থেকে উত্তরণের দিশা নিয়ে আলোচনা করা সময়ের দাবি।

বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, মুসলিমদের লক্ষ্য করে রাজনীতি করাই বিজেপির কৌশল। তাই এই সমাজের মধ্যে দলের গ্রহনযোগ্যতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে অসমের মুসলিম সমাজেও বিজেপির প্রত্যাশিত গ্রহনযোগ্যতা এখনো আসেনি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটি হলো অন্য দল থেকে কিংবা নির্দল হয়ে নিজের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার যে সুযোগ অতীতে ছিল সেই পথও বন্ধ করে দিয়েছে ২০২৩ সালের লোকসভা-বিধানসভার ডিলিমিটেশন। রাজ্যের ১২৬ বিধানসভা আসনের মধ্যে কমেও ত্রিশটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র ছিল,কিন্তু ডিলিমিটেশনের পর সেই চিত্র নেই। বিভাজনের ফায়দা তুলে সহজে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। একই অবস্থা হয় ২০২১ সালের ভোটেও। কংগ্রেস - ইউডিএফ আঁতাত করে ভোটে লড়লেও ২০১৬ সালের তুলনায় মাত্র একজন অধিক মুসলিম বিধায়ক বিধানসভায় নির্বাচিত হন। এটাই হয়তো অসমের ইতিহাসে সর্বশেষ বৃহৎ মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা হিসাবে আগামী দিনে ইতিহাসের খাতায় লিপিবদ্ধ হবে! ভোটের রাজনীতিতে চলমান সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ডিলিমিটেশন হয়েছে এতে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে মুসলিম বিধায়কদের সংখ্যা কুড়িতে নেমে এলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না!

২০০৫ সালে রাজ্যে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ বলে কথিত আইএমডিটি আইন দেশের উচ্চতম আদালতে বাতিল হওয়ার পর কংগ্রেসের উপর রাজ্যের মুসলিমদের আস্থা কমতে থাকে। রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তৎকালীন ছাত্র সংস্থা আসুর কেন্দ্রীয় নেতা সর্বানন্দ সানোয়ালের দায়ের করা মামলায় আইএমডিটি বাতিলের পেছনে আদালতে কংগ্রেস সরকারের দুর্বল হলফ নামা দায়ের করার বিষয়টি কাজ করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। ফলে ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক,সামাজিক অধিকার রক্ষা ও বঞ্চনার প্রতিবাদ করার জিগির তুলে রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করে ইউডিএফ।রাজ্যের প্রথম সারির বিভিন্ন মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে রাজনৈতিক দল গঠন হলেও পরবর্তীতে এর কর্তৃত্ব একা চলে যায় জমিয়ত নেতা, শিল্পপতি, ধনকুবের মওলানা বদর উদ্দিন আজমলের হাতে। পাশাপাশি গত লোকসভা ভোটে সংখ্যালঘুদের দল হিসাবে পরিচিত ইউডিএফের বিপর্যয়,খোদ দলপতি মওলানা বদর উদ্দিন আজমলের হার অবশ্যই রাজ্যের মুসলিম রাজনীতির জন্য চ্যালেঞ্জের। এছাড়াও বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সর্বজনগ্রাহ্য এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মুসলিম নেতৃত্বের অভাব মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক অবস্থানকে খাদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। অসমের গত তিন বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সব দল মিলে ২০১১ সালে রাজ্যে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ছিল ২২ জন,২০১৬ সালে ২৮ জন ও ২০২১ সালের বিধানসভায় ২৯ জন। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে কংগ্রেস থেকে মুসলিম ভোটের বৃহত্তর অংশ ইউডিএফের দিকে ধাবিত হয়। এতে আজমলের দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভোট

শুরুতে এই দল নিয়ে সাধারণ মুসলিমরা খুবই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু সময়ের তালে সব কিছু পালটে গেছে। সবশেষে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে দ্বিতীয় বারের মতো বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রীত্বের দ্বায়িত্ব পান।এরপর থেকেই ইউডিএফের একাংশ বিধায়ক শাসক দলের স্থাবক হয়ে পড়েন বলে সময়ে সময়ে অভিযোগ উঠে। এমনকি দলীয় সুপ্রিমোর জ্ঞাতসারেই রাজ্যসভা ভোট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীকে জেতাতে ইউডিএফের বিধায়করা ভোট দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু বিষয়ে ইউডিএফের বিধায়কদের রাজ্যের ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে বেশি মাখামাখি প্রকাশ্যে আসে।এতে সামগ্রিক কোন লাভ না হলেও বিধায়কদের ব্যক্তিগত মুনাফা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জিগির তুলতে ইউডিএফকে ব্যবহার করছিল বিজেপি। তবে সাধারণ মানুষের এই খেলা বুঝতে অবশ্য কোন অসুবিধা হয়নি।যার জেরে গত লোকসভা ভোটে তিন আসনে প্রার্থী দিলেও তিনটিতেই হারের মুখ দেখতে হয় ইউডিএফকে।ধুবড়িতে হারেন খোদ দলের সুপ্রিমো মওলানা বদর উদ্দিন আজমল।হাইলাকান্দি জেলায় ইউডিএফের তিন জন বিধায়ক থাকা সত্তেও এখানে আজমলের দলকে রীতিমতো ধরাশায়ী হতে হয়।সাধারণ মুসলিম ভোটাররা ধরে নেন রাজ্যে বিজেপিকে প্রতিহত করতে হলে আগে ইউডিএফকে উৎখাত করতে হবে। তাই হয়েছে। কিন্ত দুই দশক আগে ইউডিএফকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে প্রত্যাশা ও উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল সেটিই মাঝপথে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের ফলাফল থেকে একটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় রাজ্যের মুসলিমদের কাছে শেষ ভরসা কংগ্রেস। কিন্তু অসমে কংগ্রেস দলে এক সাংসদ রকিবুল হোসেন ছাড়া সেই মাপের কোন মুসলিম নেতা নেই। বরাক উপত্যকায়ও কংগ্রেসের মধ্যে তেমন সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব নেই।এদিকে, রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসে মুসলিমদের আধিপত্য থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ একটাই,রাজ্য রাজনীতিতে যেভাবে মেরুকরণ ধরিয়েছে বিজেপি,আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এর ব্রেণ্ডিং চলছে, এতে সফট হিন্দুত্বের পথে দলকে পরিচালিত করতে বাধ্য কংগ্রেস। ফলে এই দলেও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সম্ভবনা কম মুসলিমদের। কিন্তু বিকল্প নেই এই সময়ে। এই অবস্থায় আগামীতে রাজ্য রাজনীতির পট পরিবর্তন হলেও মুসলিম নেতৃত্ব উঠে আসার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। প্রয়াত ময়নুল হক চৌধুরী, মওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী, ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানী, শহিদুল আলম চৌধুরী, আব্দুল মুহিব মজুমদাররা এক সময় বরাক থেকে উঠে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। শাহাদুল্লা,আনোয়ারা তাইমুর অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি সামলিয়েছেন। কিন্তু হালফিলে বরাক কিংবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সর্বজনগ্রাহ্য কোন নেতৃত্ব না থাকায় মুসলিমদের কাছে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাকের বর্তমান মুসলিম বিধায়করা সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার সেই যোগ্যতা নেই। শিক্ষাদীক্ষা,দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নন। তা অতীতে বার বার প্রমানিত হয়েছে।এদের বেফাঁস মন্তব্য,চাটুকারিতা বিভিন্ন সময় উল্টো গোটা মুসলিম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়েছে।ফলে তাঁদের কে 'নেতা' নয় নিছক 'জনপ্রতিনিধি' হিসাবে বিবেচনা করাই শ্রেয় বলে আজকাল অনেকেই মনে করেন।

রাজ্যের মুসলিমদের এই রাজনৈতিক, সামাজিক সংকটের সময় বরাক কিংবা অসমে সক্রিয় থাকা তিনটি ধর্মীয় সংগঠন জমিয়ত, আহলে সুন্নত, নদওয়া কোন সঠিক দিশা দেখাতে পারছে না। বরং সময়ে সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তারা সুবিধাবাদী অবস্থান নিচ্ছেন। বিশেষ করে বরাকে জমিয়তের প্রাণ পুরুষ মওলানা আহমদ আলি ও নদওয়ার আমিরে শরিয়ত মওলানা তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়ার মৃত্যুর পর ওই দুই সংগঠনে কোন সর্বজন গ্রাহ্য নেতা নেই। রাজ্যের মুসলিম রাজনীতির সামনে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে তা মোকাবিলা করার মতো কোন প্রস্তুতি এই সমাজের মধ্যে নেই বললেই চলে।পঞ্চায়েত রাজনীতিতে একসময়ে গ্রামের মুসলিমদের আধিপত্য থাকলেও বিধানসভার ন্যায় হিন্দু-মুসলিম ভোটের পাটিগণিত মিলিয়ে পঞ্চায়েতে ডিলিমিটেশন হয়েছে।ফলে ক্ষমতা দখলে শাসক দল এগিয়ে থাকবে।সেটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে বিগত দিনে দেখা গেছে ভোট এলেই মুসলিম সমাজে হঠাৎ করে এক তৃতীয় শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদের বেশিরভাগ শ্রমজীবী, নিরক্ষর,অর্ধশিক্ষিত তারা তাদের নিজস্ব এক রাজনৈতিক এজেণ্ডা নিয়ে বের হয়।সারা বছর রাজনীতির কোন খবর না রাখলেও ভোটের সময় তারাই শিক্ষিতদের কোন প্রার্থীকে ভোট দেবেন,কার নেতৃত্বে সরকার গঠন হবে এসবের শলা দেন। উদাহরণস্বরূপ বলাযায়,এবার করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে হাইকোর্টের বরিষ্ট আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল।ওই লোকসভা আসনে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম ভোট বেশি। কিন্তু এরপরও তাঁকে হারের মুখ দেখতে হয়। এই হারের পেছনে উল্লেখিত এই তৃতীয় শ্রেণির ভুমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে মুসলিমদের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার সময় এসে গেছে। এজন্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন গুলিকে ন্যস্তস্বার্থ এবং সুবিধাবাদী চরিত্র পরিহার করে দায়িত্বশীল হতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম সমাজের অতি উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর রাজনীতি বিমুখতা ত্যাগ করে অন্য জনগোষ্ঠী যেমন বড়ো, মনিপুরি,কার্বি ও ডিমাসারা যে ভূমিকা পালন করেন তা করতে হবে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন,মুক্তমনা,গনতন্ত্র প্রেমী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

তবেই অসমে মুসলিমদের সামনে যে রাজনৈতিক প্রত্যাহ্বান ধেয়ে এসেছে তাকে মোকাবিলা করা সম্ভব। অন্যথায় শুধু কঠিন পরীক্ষা নয়,কঠিনতম পরিস্থিতি দৃশ্যমান।

<><><><><>

মুসলিম সমাজের উত্তরণে প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর

এক ঋদ্ধ অতীত ইতিহাসের অধিকারী এক জাতিগোষ্ঠী ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় গোটা বিশ্বজুড়ে যে সম্প্রদায়ের পদচারণ সেই মুসলিম সমাজ কার্যত কোণঠাসা। রাজনৈতিক শোষণ আজ বিশ্বব্যাপী। কিন্তু নিজেদের অতীত ইতিহাস কিংবা ধর্মীয় চেতনাকে কাজে লাগিয়ে এই সমাজকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোন তদ্বির নেই। বরং ইদানীং বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণি বিভাজন প্রকট হয়ে উঠেছে। এনিয়ে আত্মসমালোচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে মুসলিমরা অপমানিত হচ্ছেন, তার দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমান করার প্রবণতা আজকাল প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই চিন্তা ধারা সঠিক নয়। বরং সব ক্ষেত্রে নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে না পারলে এভাবে অপমানিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যুক্তি-বুদ্ধি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার ব্যতীত কোন সমাজ অথবা সম্প্রদায়ের উন্নতি এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে যাদের হাতে উন্নত প্রযুক্তি তারাই অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে-এ সত্য কোন গণ্ডমূর্খ ব্যক্তির পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব। ইহকাল মুসলিমদের কাছে একমাত্র জীবন না হলেও এটাকে উপেক্ষা করে কোন ধরনের বৈরাগ্য বা জীবন বিমুখতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। বরং জগৎ প্রকৃতির নিয়মকানুন অনুসন্ধান করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। শুধু তাই নয়, এই ব্রক্ষাণ্ড যে কোন আরাধ্য দৈব শক্তি নয়, বরং মানুষের অধিন এক বিশাল প্রকৃতি, তা ঘোষিত হয়েছে স্পষ্টভাবে। কিন্তু কীভাবে এই বিশাল ব্রক্ষাণ্ডকে মানুষ নিজের অধিনে নিয়ে আসবে তা নিয়ে কোন গবেষণা অনুসন্ধানের প্রয়াস মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায়না। আমাদের "আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামাদের" খেয়াল সে দিকে পৌছয় না। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক বলা হচ্ছে তাতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষার কোন সুযোগ-অবকাশ নেই। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শুধু উপেক্ষিত নয়,অনেকের বিচারে হয়ে উঠেছে অনৈস্লামিক। একসময় মুসলিম উলামারা তেমনটাই প্রচার করতেন। এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছেন বলে কেউ আর বিপক্ষে কথা বলছেন না। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেমগন যে এগিয়ে এসেছেন, তার দৃষ্টান্তও বিরল।

প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হলো প্রকৃতি জগৎ, মুলত কার্য-কারন পদ্ধতির দ্বারাই প্রকৃতি জগৎকে জানা হয়। কিন্তু সমাজ ও মানবিক জীবনকে বিষয়বস্তু করে গড়ে উঠা মানববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি ভিন্ন, নেহাৎ কার্য-কারণ তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য, দীর্ঘদিন ধরে লালিত তার মূল্যবোধ, অন্য ব্যক্তি ও প্রকৃতি জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, মানববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। জাগতিক বিবর্তন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সকল বিষয় নিয়ে যেভাবে গবেষনা অনুসন্ধানের দরকার তা মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত। কিছু ব্যক্তি হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন, এটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সেদিকে সম্প্রদায়ের সাধারণ কোন ঝোঁক চোখে পড়ে না। ইতিহাস চর্চায় কিছুটা অবদান বিদ্যমান থাকলেও সমাজ ও মানববিদ্যার অন্যান্য বিষয়গুলোতে মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান আমাদের গোচরে আসছে না। ধর্ম ও বিদ্যা শিক্ষায় মুসলমানদেরকে শুধু মান্য বা অনুকরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এখানে সত্য সন্ধানে অভিজ্ঞতা, বিবেক বুদ্ধি খাটানোর জায়গা সীমিত। তাই যুক্তি বুদ্ধির চর্চা মুসলিম মন-মানসে দীর্ঘদিন থেকে অনুপস্থিত। যা আছে তা হলো অন্যের অনুকরণ। এভাবে মুসলিম সম্প্রদায় এক পরনির্ভরশীল সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। স্বাধীন ও সাবলম্বী হতে গেলে অনুকরণ সর্বস্ব ভাবধারা ত্যাগ করে যুক্তি-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস সেখানে বাঁধা নয়, বরং এটাকে উৎসাহিত করে। অন্যকে দোষারোপ না করে, বা অন্য কেউ এসে সাহায্য করবে, সেই প্রতিক্ষায় না থেকে এখন করনীয় হলো--(১) নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলে পাঠচক্র গড়ে তোলা ও মুক্ত আলোচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা (৩) ধর্মচিন্তা ও বিজ্ঞান মনস্কতার ভিত্তিহীন বিরোধ দূর করা (৪) কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যাপকতর করা (৫) যারা বিজ্ঞান শিক্ষায় এগিয়ে এসেছে তাদেরকে গবেষনায় উৎসাহিত করা ও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া (৬) যে সকল যুবকরা নেতাদের তাবেদারী করছেন অথবা ধর্মীয় নেতাদের অন্ধভাবে অনুকরণ করে নিজেদের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করছেন তাদের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করা এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ দান করা, (৭) ভিন্নমতকে সহ্য করার ধৈর্যধারণ এবং মানসিক উদারতা গড়ে তোলা, এবং (৮) নানা বিষয়ে মানুষের মধ্যে চিন্তাধারার বিভিন্নতা বা বিরোধ দেখা দিলে সেই ভিন্নতা বা বিরোধকে ভিত্তিকরে দল গঠন করে দলাদলির পরিবর্তে যুক্তি, বিবেক ও প্রামাণাদির সাহায্যে তা দূর করার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে নতুন প্রজন্মের সচেতন যুবকরাই অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন, এ আশায় রইলাম।

<><><><><>

তৃণমূলের রাজনীতি এবং সুস্মিতার ভবিষ্যৎ

উত্তম কুমার সাহা

অসম চুক্তির ছয় নং দফা রূপায়ণে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক গঠিত বিপ্লবকুমার শর্মা কমিটি মোট ৬৭টি সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে ৫৭টি অর্থাৎ ওই রিপোর্টের ৮৫ শতাংশ কার্যকর করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব এবং আগামী বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে সে সবের বাস্তবায়ন করা হবে, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এমন ঘোষণার পর আসামের বাঙালিরা আশঙ্কায় ভুগছেন। কী আছে সেই বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্টে, বিস্তৃত না জানলেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শোনা দুই-একটি সুপারিশই বাঙালিদের আতঙ্কে রাখার জন্য যথেষ্ট। অসমিয়া বা ভূমিপুত্রদের স্বার্থ সুরক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিপ্লবকুমার শর্মার নেতৃত্বাধীন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি। এখন প্রশ্ন হলো, অসমিয়া কারা বা আসামে কাদের ভূমিপুত্র বলে গণ্য করা হবে? এ পর্যন্ত তাঁর কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা স্থির হয়নি বলে বিরোধীদের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী রিপোর্টের কথা টেনেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিন পুরুষ ধরে যারা আসামে বসবাস করছেন, বা ৭৫ বছরের বেশি সময় ধরে এই রাজ্যে রয়েছেন, তাদের এবং তাদের বংশধরদের ভূমিপুত্র বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কমিটির সুপারিশে ১৯৫১ সালকেই যে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ ধরা হয়েছে, তাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে বিষয়টি দাঁড়াল, জমি কেনাবেচা, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কর্মসংস্থান বা যে কোনও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ ভূমিপুত্ররাই পাবেন, তারাই হবেন রাজ্যের প্রথম শ্রেণির নাগরিক। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের নথি দিয়ে যাঁরা এনআরসিতে নাম তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য হবেন। আতঙ্কে দিন কাটানো বাঙালিরা এই সময়ে নিজেদের মনের কথা খুলে বলার জন্য একটি রাজনৈতিক দল খুঁজে বেড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। তৃণমূল কংগ্রেসের এই সুযোগটিকে কাজে লাগানোই দরকার। রিপুণ বরাকে সামনে রেখে আসামে যে দলের শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব নয়, তা আর যিনিই বুঝুন, বা না বুঝুন, রিপুণ বরা বুঝে গিয়েছেন, বুঝিয়েও দিয়ে গিয়েছেন। ইস্তফা দিতে গিয়ে তিনি

লিখেছেন, "অসমিয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না।" এই সত্যকে ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস যদি আসামের বাঙালিদের পাশে দাঁড়ানোর, তাদের সংগঠিত করার সংকল্প নেয়, তাহলে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি আসামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীও নিজেদের কথা বলার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে আসামে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একটিই বাঙালি মুখ রয়েছে, তিনি হলেন সুস্মিতা দেব। সন্তোষমোহন দেবের কন্যা ছাড়াও বিধানসভা, লোকসভা এবং দুইবার রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্বের জন্য সুস্মিতার বেশ পরিচিতি রয়েছে। সে সুবাদে তাঁর মুখ হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁকে কাজ করতে হবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। বরাকে বাঙালিদের যেহেতু শর্মা কমিটির রিপোর্ট সেভাবে কোনও প্রভাবিত করছে না, তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদেরই ধরতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজকের আসামে যেখানে নানা রকমের মেরুকরণ রয়েছে, কখনও অসমিয়া-বাঙালি, কখনও হিন্দু-মুসলমান, এ রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সুস্মিতা দেবের পক্ষেও কি তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে সংগঠন মজবুত করা সম্ভব হবে? এমন প্রশ্নের একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর নিজের শহরে ২০ হাজার ভোট সংগ্রহ করতে পারলেন না। ফলে সুস্মিতা দেব প্রদেশ সভাপতি হয়ে গেলেই তৃণমূলের পরিস্থিতি আমূল পাল্টে যাবে, এমনটা ভাবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। যদিও বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্টের ৮৫ শতাংশ যখন রাজ্য সরকার কার্যকর করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, সে সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিদের এই ধরনের একটা ছাতার তলায় আসা উচিত ছিল। এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি এই সময়ে একটা বিকল্প খুঁজবে। সেখানে তৃণমূলের চেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে না। ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট (ইউএমএফ) কিন্তু ১৯৮৫ সালে দেখিয়ে দিয়েছিল, সতেরো দিনও প্রচারের সময় মেলেনি, কিন্তু সতেরো আসন জিতে নিয়েছিল। প্রমাণ মিলেছিল, হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে লড়তে পারলে বাঙালি সাফল্য পায়। কিন্তু সঙ্কট যত তীব্রই হোক, এই সময়ে আসামে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে এক করা কি সম্ভব হবে? এই মুহূর্তে একে যে সোনার পাথরবাটি বলেই মনে হয়। গত লোকসভা নির্বাচনের আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউডিএফ কিছুই করতে পারবে না। এর পরও মুসলমান ভোট তৃণমূল কংগ্রেস আদায় করতে পারেনি। ফলে বিজেপির কাছ থেকে সরে

আসতে হলে বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যার কথা বিবেচনা করে কংগ্রেসকেই বেছে নেবে। তৃণমূলকে নয়। কারণ অসমে তৃণমূলের এ পর্যন্ত তেমন পরিচিতি নেই। এই দলের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কের জায়গাটা একেবারে নেই। চরের মানুষগুলির কাছেও তৃণমূলের কোনও মানসিক নৈকট্য নেই। এরা কংগ্রেসকেই কাছের বলে গ্রহণ করবেন। তৃণমূলের নামে কংগ্রেসের ভোট কেটে বিজেপিকে ফয়দা পেতে দেবেন না। ফলে আসামের সব অংশের মানুষের কাছেই তৃণমূল একটি ভিন রাজ্যের দল। এটি একটি ব্যক্তিনির্ভর দল। তার সমস্ত কিছুই একেবারে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক। তাঁর নীতি আদর্শ, পদ্ধতি প্রকরণ, কৌশল, আন্দোলন, আন্দোলন-বিরোধিতা সবই পশ্চিমবঙ্গের কথা মাথায় রেখে। রাজনৈতিক দিক থেকে আসামের সঙ্গে এর বহু পার্থক্য। সুস্মিতা যদি খুব চেষ্টাও করেন, তবু সন্দেহ থেকেই যায়, তৃণমূল তাঁকে কতটা সাহায্য করবে। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে দল তাঁর ওপর ভরসা করেছিল। যার ভুলেই হোক, তৃণমূল সেখানে কিছুই করতে পারেনি। শিলচর লোকসভা আসনেও তিনি সম্মানজনক ভোট আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। সেখানে এত বড় রাজ্যের দায়িত্ব তাঁকে দেবেন কিনা, এও চর্চার বিষয়। এর পরও যে কথাটা উল্লেখ না করলেই নয়, সুস্মিতা নিজে কি তৈরি এমন একটা চ্যালেঞ্জ নিতে? দ্বিতীয়ত, আসাম নিয়ে তৃণমূলের এখন ভাবার ফুরসতও নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই সময়ে ডাক্তারদের আন্দোলনে প্রচণ্ড চাপে রয়েছেন। মমতার দরবারে সুস্মিতা এখন একটু গুরুত্বহীন। সুস্মিতা যে রাজ্যসভাতে রয়েছেন, সেটাই দল ভুলে গিয়েছে। তাকে যদি দল দায় বলে মনে করে, তাহলে সুস্মিতার এখন থেকেই ভাবা উচিত। শিলচরে তাঁর নিজস্ব কোনও ভোট নেই, লোকসভা নির্বাচনে এটা প্রমাণিত। ফলে রাজনীতিতে টিঁকে থাকতে হলে তাঁকে কংগ্রেসেই ফিরতে হবে। দুইবার দলের টিকিট পেয়েছেন। মহিলা কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী ছিলেন। কাছাড়ে কংগ্রেসিরা তাঁর আসার অপেক্ষাতেই। আগে যারা ভেবেছিলেন, তাঁর জন্য জায়গা পাচ্ছেন না। সুস্মিতা দল ছাড়ার পর প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, তিনি না থাকলে কংগ্রেস দলটাও প্রায় নেই। ফলে এখন তিনি এলে আগের বিরোধিতা আর থাকবে না। কংগ্রেসে ওর বড় সুবিধার জায়গা, তিনি সবাইকে চেনেন। দলটাকে জানেন। এখন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও কংগ্রেসে নেই, ফলে তিনি আধিপত্য পাবেন। দুইবার রাজ্যসভায় পাঠানোর পর সুস্মিতাকে আর টিকিট দেবে না তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে তাকে লড়াই করেই জায়গা করতে হবে। এই অবস্থায় আসামে যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নেই এবং কংগ্রেসেও যদি ফিরতে না চান, সুস্মিতা একটা আঞ্চলিক দল তৈরি করতে পারেন। তাতে তাঁর অনেক বেশি সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে।

<><><><>

শারদ উৎসব উপলক্ষে হাইলাকান্দিবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শ্রীকিষান সারদা কলেজের বর্ষব্যাপী চলা প্ল্যাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠান সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
শ্রীকিষান সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি

সত্য কাহিনী

ভূতের মার্বেল খেলা

অমিত রঞ্জন দাস

ভূত ব্যাপারটাই বিশ্বের এক বহু চর্চিত বিষয়। ভূত-প্রেত - প্রেতাত্মা। এই শব্দগুলোর আদৌ কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা এনিয়ে তর্কের কোন শেষ নেই। অনেকেই এসবকে শিশু ভুলানো কাল্পনিক গল্পের বাইরে কিছু মানতে রাজি নন। আবার অনেকেই ভূত-প্রেত- প্রেতাত্মাকে জীব জগতের অংশ বলে মানেন। শুধু মানেনেই না, অনেকে অনেক সময় এসংক্রান্ত প্রমানও তুলে ধরেছেন । সবকিছুর পর মোদ্দা কথা হচ্ছে ভূত বলে কিছু কি ইহ জগতে আদৌ আছে। সবসময়ই দেখা যায় ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে দুইদল মানুষ থাকেন । একদল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ভূত বলে কোন কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই। থাকতেই পারে না। আবার আরেক দল মানুষের বিশ্বাস সেই অনাদি অনন্তকাল থেকে ভূতেরা এই পৃথিবীতে বাস করছেন। তাদের নিজস্ব সংসার আছে। রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা। ফলে ভূত বরাবরই কৌতূহলের বিষয়। ভূত বা ভূতেরা আছেন কি নেই এই তর্কের আদৌ কোন সমাধান হবে কি না তা যেমন বলা মুশকিল তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে ভূতেদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তাও অনিশ্চিত। তবে ভূত বরাবরই কৌতূহলের বিষয়। বয়স অনুসারে বিভিন্ন জনের কাছে ভূতের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। যদিও আমাদের মতো মানুষের কাছে ভূতের অবস্থান বড়ই বিচিত্র। কেননা ভূত আছে কি না এনিয়ে আমরা গলা ঝেড়ে কাঁশতে পারি না। ভূত আছে এটা বললে অনেকেই আমাদের বেকডেটেড চিন্তাধারার মানুষ বলে হাসিঠাট্টা করবেন। একথা চিন্তা করে ভূতের পক্ষেও সায় দিতে পারি না। আবার ভূত নেই একথা বলতে গিয়েও তিন পা পিছিয়ে আসতে হয়। তবে আমাদের অনেক পরিচিতরা ভূতের সংস্পর্শে আসার কথা বলেছেন। আমার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে যার ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে আজও মেলাতে পারিনি। আমার জীবনের এই ঘটনা কারো কারো কাছে আজগুবি মনে হলেও আমার কিছু করার নেই। এমন ঘটনা ঠাট্টার খোরাক যোগালেও যোগাতে পারে। তা তাদের বিষয়। প্রায় পাঁচ দশক আগের কথা। আমি তখন শিশু। আমার জীবনেও ভূত দর্শনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার কথা এবারের “হাইলাকান্দি “ পুজো

সংখ্যায় তুলে ধরতে মনস্থ করেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার এই ভূত কাহিনীর সংগে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভূত দর্শনের এই কাহিনীর সংগে জড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টির ইতিহাস। সে উনিশশো পচাত্তর - ছিয়াত্তর সালের কথা। তার কিছু আগে ১৯৭১ সালে পূর্বপাকিস্তানে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ততকালীন হাইলাকান্দি মহকুমার আয়নাখাল, লক্ষ্মীনগর, সিংগালা ইত্যাদি এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় শরনার্থী ক্যাম্প বানিয়ে পূর্বপাকিস্তান (জয়বাংলা)- র উদবাস্তুদের প্রশাসনিক পর্যায়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর সেদেশে ফিরে গিয়েছিলেন এখানকার রিফুজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরা। যদিও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শরণার্থীরা স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরও হাইলাকান্দি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হওয়া শরণার্থী ক্যাম্পগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় অনেকদিন ছিল। এভাবে একটি পরিত্যক্ত ক্যাম্প ছিল বর্তমান হাইলাকান্দি জেলার আয়নাখাল গ্রামপঞ্চায়েতের সিংগালাবস্তিতে। যে স্থানে টিলার উপর এই পরিত্যক্ত রিফুজি ক্যাম্পটি ছিল তার উল্টোদিকের বাড়িটি হচ্ছে আমাদের পুরাতন বাড়ি। যে বাড়িটি এখনও আছে। এই এলাকায় পাশাপাশি কয়েকটি রিফুজি ক্যাম্প ছিল। যেখানে পূর্বপাকিস্তান (বাংলাদেশ)-র হাজার হাজার শরণার্থী আশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। এই রিফুজি ক্যাম্পগুলির একদিকে ছিল সিংগালা চা বাগান আর অন্যদিকে ছিল কৈয়া চাবাগানে যাওয়ার রাস্তা। ফলে এইসব বাগান বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এইসব পরিত্যক্ত রিফুজি ক্যাম্পে প্রতিদিন এসে মার্বেল ইত্যাদি খেলতেন। আমরাও তাদের সংগে দল বেঁধে খেলতাম। এই ক্যাম্পের সামনেই ছিল আয়নাখাল - লতাকান্দি পূর্তসড়ক। যে সড়কটি আজও আছে। একদিন সকাল ১০/১১টা নাগাদ আমি আমার আরেক বড় ভাই এবং সিংগালা বস্তির আরও তিন বন্ধু মিলে ওখানকার পরিত্যক্ত শরনার্থী ক্যাম্পের ভেতরে মার্বেল খেলছিলাম। এইসব পরিত্যক্ত ক্যাম্পে তখন বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রিফুজিরা এসব ক্যাম্পে থাকার সময় মাটির চুল্লিতে রান্না করতেন। রান্না হত খড়ি দিয়ে । ফলে শরণার্থী ক্যাম্পগুলির প্রতিটি কক্ষে বাঁশের তৈরি মাচান আর মাটির চুল্লি জরাজীর্ন অবস্থায় অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। আমরা মার্বেল খেলতে থাকা অবস্থায় হটাৎ আমাদের মার্বেল গিয়ে চুল্লির ভেতর পড়ে যায়। মার্বেল আনার জন্য চুল্লির

কাছে গিয়ে আমরা দেখি এক বিশালাকৃতি উলংগ ব্যাক্তি সেই চুল্লিতে বসে আমাদের মার্বেল হাতে নিয়ে খেলছে। তার লোমশ ভর্তি শরীরের রঙ ছিল কালো। আমরা এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যাই। ভয়ে আমরা চিৎকার করে উঠি। আমাদের চিৎকার শুনে ক্যাম্পের পেছনের জংগলে কাঠ কাটতে থাকা ২/৩ জন লোক দৌড়ে ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করে চিৎকারের কারন জানতে চান। আমরা সেই চুল্লির দিকে আংগুল দিয়ে সেই বিশালাকার ব্যক্তিকে দেখাতে চাইলে মুহুর্তের মধ্যে সেই বিশালাকৃতির ব্যক্তিটি উধাও হয়ে যায়। আমরাও হাড় হিম করা ভয় নিয়ে যে যার বাড়িতে চলে যাই। সেদিনের সে কথা মনে হলে আজও ভয়ে আঁতকে উঠি। হয়তো আপনারা ভাবছেন চোখের বিভ্রান্তি আর মনের ভ্রমের জন্য এরকম অনেক ঘটনাইতো ঘটে থাকে এতে আর বিশেষ কি। সত্যিই তাই, কাহিনী এখানেই শেষ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এমনটা নয়। এই ঘটনার নেপথ্যে আছে আরেক ঘটনা। আমি এবং আমার ভাই বাড়িতে এসে এই লোমশ ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনার কথা মাকে বললাম। এই ঘটনা শুনতেই মা বাবা ঠাকুমাকে ডেকে আনলেন এবং এনিয়ে তাদের মধ্যে রীতিমতো গবেষণামুলক আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। মাকে বলতে শুনলাম পেরেতটা এলাকা ছেড়ে এখনও যায়নি। কে এলাকা ছেড়ে যায়নি আর পেরেতটাই বা কে? এটা জানার অদম্য ইচ্ছা আমাকে তাড়া করতে থাকে। এদিকে মার্বেল খেলতে গিয়ে আমাদের ভূত দর্শনের ঘটনার কথা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই এনিয়ে ক'দিন ধরে জোর চর্চা চলতে থাকে এলাকা জুড়ে। আমাদের বাড়িতে আশপাশের অনেকেই এসে এনিয়ে মা বাবার সংগে কথা বলে তাদের পরামর্শ দিয়ে যান যাতে কোন অবস্থায় আমাদেরকে ঐ ক্যাম্পের দিকে যেতে দেওয়া না হয়। আমাদের বাড়িতে আসা বিভিন্নজনের এনিয়ে আলোচনা থেকে এই কাহিনীর নেপথ্যের ঘটনার কথা জানতে পারি। যে ঘটনার সংগে জড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্মৃতি। পূর্বপাকিস্তান তখনও বাংলাদেশ হয়নি। পূর্বপাকিস্তান তখন ভাষা আন্দোলনে উত্তাল। এরই মধ্যে ওপার বাংলার জকিগঞ্জের বাসিন্দা ধীরু রায়ের সংগে একই গ্রামের রাধা রাণীর বিয়ে হয়। শুরু থেকেই তাদের সংসারে অশান্তি ছিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খিটমিট লেগেই থাকত। এই খিটমিটের কারন ছিল স্ত্রীর প্রতি ধীরুর ভালোবাসার কমতি। শুধু তাই নয়, পাশের বাড়ির এক মহিলার সংগে ধীরুর অবৈধ সম্পর্ক থাকাকে কেন্দ্র করে এই সমস্যার সূত্রপাত বলে জানা যায়। ধীরুর মা তার পুত্র এবং পুত্রবধুর সম্পর্কের টানাপোড়নের কথা আমার মায়ের কাছে গল্প করেছিলেন। ধীরুর মা বাসন্তী দেবী আরও বলেছিলেন। তার পুত্র এবং

পুত্রবধুরর মধ্যে চলতে থাকা অশান্তি নিয়ে তিনি খুব চিন্তিত। জকিগঞ্জের বাড়িতে থাকার সময় ধীরু আর তার স্ত্রীর মধ্যেকার ঝগড়া সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এতে ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন ধীরুর মা। কি করলে পুত্র এবং পুত্রবধূর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা যায় এনিয়ে ভাবতে থাকেন তিনি। একসময় জকিগঞ্জের পাশের গ্রামের এক মহিলা তান্ত্রিককে এনে তার এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। সেই মহিলা তান্ত্রিক তখন ধীরু এবং তার পত্নীর মধ্যেকার সম্পর্ককে আরও গভীর এবং অন্তরংগ করার জন্য টুনাযাদুর মাধ্যমে এক জিন ভূতের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিভাবে জিনভূতের সাহায্যে পুত্র এবং পুত্রবধুর সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলেন সে ঘটনা ধীরু রায়ের মা আমার মা-কে শুনিয়েছিলেন। মহিলা তান্ত্রিকের সেই জিন ভূত ধীরুর উপর ভর করেছিল। যে ধীরু মাত্র ক'দিন আগেও স্ত্রীর মুখ দেখতে চাইত না সেই ধীরু স্ত্রীর গলা আকড়ে ধরে থাকতে আরম্ভ করে। এদিকে দেখতে দেখতে স্বাধীন বাংলার দাবিতে মুক্তি যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খান বাহিনীর নারকীয় অত্যাচার চলতে থাকে পূর্ববাংলার বাংগালীদের উপর। এদিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববাংলার লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ভারতে। সেইসব শরণার্থীদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন তৎকালীন হাইলাকান্দির মহকুমার সিংগালা এলাকার বিভিন্ন ক্যাম্পে। আমাদের এখানকার মার্বেল ভূতকে যে ক্যাম্পে দর্শন করেছিলাম সেই ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন জকিগঞ্জের সেই ধীরু রায় এবং তার পরিবার। যেহেতু এই শরণার্থী ক্যাম্পের উল্টোদিকে ছিল আমাদের বাড়ি এবং আমরা এখানকার পুরাতন বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে ক্যাম্পের বিভিন্নজন আমাদের বাড়িতে আসতেন। মায়ের কাছে শোনা মতো ধীরু এবং তার মা এবং স্ত্রী আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন এবং তাদের পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা আর পূর্বপাকিস্তানে তাদের উপর চলা নির্মম অত্যাচারের মর্মান্তিক ঘটনার কথা শোনাতেন । ধীরুর মায়ের আমার মা-কে বলা গল্প মতে জকিগঞ্জ থেকে হাইলাকান্দি মহকুমায় আসার সময় একবারের জন্যও ধীরু তার পত্নীর গলা ছাড়েননি। ধীরে ধীরে ধীরুর মা উপলব্ধি করেন যে, তার পুত্র পুত্রবধূর সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্য ভূতের আশ্রয় নেওয়াটা তার মস্ত ভূল হয়েছে। কেননা

স্বামীর ভালোবাসা বৃদ্ধি করার জন্য মহিলা তান্ত্রিকের করা টুনা-যাদুর প্রভাবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এতটাই বেশী হয়ে গিয়েছিল যে দিনে রাতে ধীরু তার পত্নীর গলা আকড়ে থাকতে আরম্ভ করে। এমনকি গভীর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে ধীরু। পাশাপাশি ধীরু শারিরীকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবোলতাবোল বকতে থাকে। স্ত্রী থেকে দূরে থাকা ধীরু স্ত্রীকে সবসময় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকার পাশাপাশি তাকে নিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে পালাতে চায়। ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য তান্ত্রিকের তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীর জন্য বেচারা ধীরু একপ্রকার উন্মাদ হয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ধীরুর মা অনেক খোঁজাখুঁজির পর তৎকালীন হাইলাকান্দি মহকুমার লালার এক গ্রাম থেকে এক তান্ত্রিককে খোঁজে আনেন। ইনিও একজন মহিলা তান্ত্রিক ছিলেন। সেই তান্ত্রিক আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারের টিলার উপরের রিফুজি ক্যাম্পে থাকা ধীরুদের বাড়িতে এসে তন্ত্রমন্ত্রের কাজ আরম্ভ করেন। ধীরুর মায়ের অনুরোধে আমার মা বাবা এবং আরও দুতিনজন প্রতিবেশী তাদের বাড়িতে গিয়ে এসব ঝাড়ফুক পর্যবেক্ষণ করেন। ধীরুকে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে সেই মহিলা তান্ত্রিক তার তন্ত্র সাধনা আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ তন্ত্রমন্ত্র পাঠের পর তান্ত্রিক ধীরুকে কিছু একটা খাওয়ান। এরপর ধীরু নাগাড়ে বমি করতে থাকে। বমি করতে করতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ে সে। তারপর একসময় ধীরু অজ্ঞান হয়ে যায়। এদিকে ধীরু যখন অজ্ঞান তখন সেই মহিলা তান্ত্রিক উপস্থিত লোকদের জানান যে, জকিগঞ্জের যে তান্ত্রিক স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালো পাওয়ার জন্য ধীরুর উপর টুনাযাদু করে ভূত চালান দিয়েছিলেন সেই ভূত ধীরু এবং তার পরিবারের সংগে হয়ে এই ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যে জিন ভূতের সাহায্যে ঐ তান্ত্রিক টুনাযাদু করেছিলেন সেই তান্ত্রিকের অভিজ্ঞতা কম থাকার জন্য তিনি ভূতকে ডেকে আনতে পারলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। যারফলে জকিগঞ্জের সেই ভূত সিংগালা বস্তির এই রিফুজি ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যেহেতু সে আর জকিগঞ্জে ফিরে যেতে রাজি নয় তাই ধীরুর শরীর থেকে তাকে সরিয়ে এখানকার কোন যায়গায় তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এদিকে ততক্ষণে ধীরুর জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে স্ত্রীর গলা ছেড়ে দেয়। সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে। তবে তার শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে সেই তান্ত্রিক ধীরুর উপর ভর করে থাকা জকিগঞ্জের সেই ভূতকে ধীরুদের রিফুজি ক্যাম্পের পিছনের এক শ্যাওড়া গাছে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। গভীর রাতে সেই শ্যাওড়া গাছের ডালে কাপড় বেধে দিয়ে সেখানে ভূতকে থাকার ঠাঁই করে দেন। সেইসংগে তান্ত্রিক ধীরুর বাড়িতে উপস্থিতদের জানিয়ে দেন যে এই ভূত বছরের পর বছর ধরে এখানে বাস করবে। সে কারো কোন ক্ষতি করবে না। অনেক সময় শিশু কিশোর সহ কোন মানুষ এই ভূতের সাক্ষাৎ পেলেও পেতে পারেন। যদি কেউ তাকে দেখে ভয় পান তাহলে তার জ্বর হওয়া সহ তার ব্যবহারে ভৌতিক আচরণ প্রকাশ পেতে পারে। তবে কোন অবস্থায় এখানে থাকা এই ভূত কারো মৃত্যুর কারন হবে না বলে তিনি উপস্থিত ব্যাক্তিদের সান্ত্বনা দেন। সে তার মতো করে এখানে জীবন যাপন করবে। তার বিশালাকার শরীরের রঙ হবে কুৎসিত কালো। পুরো শরীর থাকবে লোমশ। ঠিক আমরা মার্বেল খেলতে যে ভূতের দর্শন পেয়েছিলাম তান্ত্রিকের দেওয়া বিবরণের সংগে তা হুবহু মিলে গেছে। তাই আমাদের ভূত দর্শনের পর আমরা যখন বাড়িতে গিয়ে একথা বলেছিলাম তখন মা বাবাকে বলেছিলেন পেরতটা এখনও এলাকায় রয়েছে। তার মানে তান্ত্রিক ধীরুর সংগে আসা জকিগঞ্জের সেই ভূত বা পেরতকে এখানে ঠাঁই দিয়েছিলেন সে এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত। আমাদের মার্বেল খেলার সময় ভূত দর্শন ছাড়াও এই এলাকার আরও অন্যান্য মানুষও লোমশ গায়ের বিশালাকৃতির মানুষকে দেখার কথা বলেছেন। বছর পাঁচেক আগেও এই এলাকার তিন বন্ধু রাতে আয়নাখাল -লতাকান্দি পুর্তসড়ক দিয়ে যাবার সময় সিংগালা বস্তির সেই রিফুজি ক্যাম্পের পাশের একটি গাছে লোমশ শরীরের এক মানুষকে দেখার কথা বলেছিলেন। তারা সেই রাতেই আশপাশের লোকজনকে ডেকে এনে সে গাছে উঠে তন্ন তন্ন করে খোঁজেও সেই লোমশ ব্যক্তিকে আর দেখতে পাননি। এক ঘটনাচক্রে বর্তমান বাংলাদেশের জকিগঞ্জের এক ভূতকে নিজের দেশের সীমানা ছেড়ে পরদেশে নিসংগ জীবন যাপন করতে হচ্ছে। যার সংগে এদেশের এখানকার মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র তান্ত্রিকের জন্য এক বিদেশী ভূত অনুপ্রবেশকারীর মতো এখানে বাস করছে। আমার এই ভৌতিক কাহিনীর আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু মার্বেল খেলতে গিয়ে নিজের চোখে দেখা অদ্ভূতদর্শন সেই মানুষটি কে বা কি তার কোন ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে আজও মেলাতে পারিনি। আমাদের ব্যস্ততম জীবনে চলার পথে বহু সময় এ জাতীয় ঘটনার সাক্ষী হই আমরা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে যার কোন ভিত্তি নেই। আবার এজাতীয় ঘটনার কোন ব্যাখ্যাও নেই। যারফলে একদিকে ভূত-প্রেত -প্রেতাত্মা আর অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। এই দুইয়ের সংঘাত চলে আসছে অতীতকাল থেকে আর আগামীতেও চলবে। আর এভাবেই বিশ্বাস - অবিশ্বাসকে সংগী করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের দিকে।।

<><><><><>

জীবন বৃত্তান্ত

সোনালি আচার্যের কলাম

আমার জীবন যুদ্ধ

মা সরস্বতীর চরণে প্রণাম নিবেদন করে আমার আমিকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার সংকল্প নিয়ে কলম ধরেছি। জানি কলম চালানোর আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবুও আমার জীবন যুদ্ধের কথা তুলে ধরতে চাই। আজকের সোনালি হওয়ার নেপথ্যের দিনগুলিকে তুলে আনতে আমার এই প্রয়াস। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আজকের দিনে একের পর এক বিশ্বরেকর্ড আমার দখলে। আজকের দিনে আমি ৫৪টি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। গিনিজ ওয়ার্লড রেকর্ড সহ বহু রেকর্ডের অধিকারী আমি। আজকের এই আমি হওয়ার পেছনের অনেক কথাই আপনাদের অজানা। আমার আত্মজীবনীমূলক এই রচনায় আমার সংঘাতপূর্ণ ৪৮ বছরের জীবনকে ফিরে দেখার চেষ্টা করেছি। আর পিছন ফিরে থাকাতে গিয়ে আমার জীবন যুদ্ধের কণামাত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সে ১৯৭৬ সালের কথা। হাইলাকান্দি তখনও জেলা হয়নি। গ্রামের গন্ধ মাখা এক অখ্যাত মহকুমা। সেই মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তের কাটলিছড়ায় আমাদের পরিবারের বাস ছিল। ২৮শে মার্চ ১৯৭৮ সাল। সেদিন ছিল মহাবারুনী। সময় তখন বিকাল ৪ টা ১০ মিনিট। কাটলিছড়ায় জন্ম নিয়েছিলাম আমি। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে হতে মায়ের মুখে শুনেছিলাম ছোটবেলার অনেক গল্প। শুনেছিলাম আমার জন্মের দিন বারুনীমেলা উপলক্ষে ঘর বাড়ী পরিষ্কার করা হচ্ছিল। আমার ঠাকুমা ঁমনোরামা দেবী গঙ্গা মায়ের পুজো সারছিলেন। হঠাৎ বিকেলবেলা আমি আমার মায়ের কোলে আসার আগে মা অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু সংজ্ঞা হারালেও তাঁর বোধশক্তি লোপ যায়নি। তিনি দেখলেন যে আকাশ থেকে সরস্বতী ঠাকুরের মুর্তি আমাদের ঠাকুর ঘরে নেমে এসেছে। সেই ঠাকুর ঘর থেকে একজন মহিলা ছোট্ট একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে মায়ের পাশে রেখে দেয়। মা নাকি ওই সংজ্ঞাহীন অবস্থায়ই বুঝতে পারেন যে ওনার কোলে নিশ্চয়ই এক কন্যা সন্তান আসছে। যে সরস্বতীর বরদান পেয়েছে। পড়াশুনায় ভালোই ছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতির জন্য সেভাবে করা হয়নি। সে প্রসঙ্গ থাক, অন্য কোনদিন অন্যকোথাও বলব। হয়তো নৃত্যশিল্পী হয়েই জন্ম নিয়েছিলাম।

ছোটবেলায় একদিন আমাদের পাড়ায় দুর্গোপূজার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি মেয়েরা সেজেগুজে তৈরী হচ্ছে অনুষ্ঠান করার জন্য। আমার খুব ইচ্ছে হল সেজে ওইভাবে নাচ করার। মা তখন অফিসে। আমার বয়স ৬। কোনদিন একা যাইনি মায়ের অফিসে। কিন্তু নাচের প্রবল ইচ্ছা আমাকে নিয়ে গেলো। মা তো আমাকে দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে এসেছো। বললাম একা, মা বললেন কেন ? আমি বললাম তুমি চলো আমার সাথে, আমি নাচ করব। তুমি ওদেরকে বলো, আমায় নাচ করার সুযোগ দিতে। মা বললেন, তুমি তো নাচ শেখোনি, কি নাচবে ? আমি শিখেছি, "প্রজাপতি, প্রজাপতি ....." বলে নাছোড়বান্দা। মা বুঝিয়ে টুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি আবারো গেলাম মায়ের কাছে। ছোট্ট মেয়ের অবদার ফেলতে না পেরে মা এসে পাড়ার এক দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন সবকিছু। অনুরোধ করলেন যদি আমাকে কোন সুযোগ দেওয়া যায়। ওই দাদা বললেন প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আর একটু পরে শুরু হয়ে যাবে। পরের বছর নিশ্চয়ই সুযোগ দেবেন। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। মা বোঝালেন, এরকম অনুরোধ করে নাচতে নেই। তুমি আগে ভালো করে নাচ শেখো, তখন সবাই তোমার নাচ করার জন্য নিমন্ত্রন করবে।

সেদিন থেকে মা নাচের শিক্ষক খুঁজতে লাগলেন। সৌভাগ্যবশত পাড়ার একজনের বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান ছিল। আমরাও নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে পরিচয় হয় কবিতা ভট্টাচার্যের সাথে। কবিতা ভট্টাচার্য খুব ভালো নৃত্যশিল্পী ছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন আমায় উনি নাচ শেখাবেন কি না। আমার এত উৎসাহ দেখে উনি রাজী হলেন। পরদিন থেকে যেতে বললেন। প্রথম নাচ "এই আকাশে, আমার মুক্তি..." শিখতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই মায়ের অফিসে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হবে। মা আমার নামটাও দিয়ে আসলেন। সে কী আনন্দ। সেজেগুজে সাদা কাগজের মালা পরে অনুষ্ঠান করে যাওয়া। প্রথম অনুষ্ঠানেই খুব ভালো হলো। মায়ের অফিসার ডেপুটি কমিশনার নাচ শেষ হওয়া মাত্র স্টেজ থেকে কোলে নিয়ে বসলেন। খুব প্রশংসা করলেন। সেই থেকে কবিতা ভট্টাচার্যের (মনি মাসী) কাছে নাচ শেখা চলতে থাকলো। তারপর স্কুলের অনুষ্ঠানে বা রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সব জায়গায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম আর বরাবরই প্রথম স্থানের অধিকারী হতাম। কখনো তো জাজেরা প্রথম পুরস্কার দিয়েও বিশেষ

পুরস্কার দিতেন। প্রতিবছর রবীন্দ্রমেলায়ও নাচ করতে খুব ভালো লাগতো। ১৩ বছর বয়স থেকেই আমি নাচ শেখাতে শুরু করি। প্রথম ফীজ পেয়েছিলাম ৫০ টাকা। আজ ও মনে আছে। প্রথম পাঁচটি দশ টাকার নোট হাতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা। কীভাবে খরচ করেছিলাম সেটাও খুব মনে আছে। ১০ টাকা মাকে, ১০ টাকা বাবাকে, ১০ টাকা দূর্গাপূজোর চাঁদা আর ২০ টাকার ম্যাগি এনে আমরা তিন ভাইবোনে খেয়ে নিই।

এতক্ষণ গল্পের মত শোনালেও পরবর্তীতে আমার নাচের জীবন যাত্রা মসৃণ ছিল না। আমার কিশোরী বেলা শেষ হওয়ার আগেই টুয়েলভ প্লাস বয়সে আমার বিয়ে হয়ে যায়। জানি অনেকেই কৌতূহল হবে এটা কিভাবে সম্ভব। কিন্তু জীবন কখনো কখনো নাটকীয় মোড় নেয় যার নিয়ন্ত্রণ কারো হাতে থাকে না। তাই পরিস্থিতি আর সামাজিক ব্যবস্থার চাপে আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল। সেই ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী আমি অন্যদিন অন্য কোথাও বলব। যারা আমাকে ছোট থেকে চেনেন আর এই মুহূর্তে এই লেখা পড়ছেন তারা আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন। আর একইসঙ্গে ওই সময় যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যত্ন আর আদর দিয়ে তাদের সেই ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না। যাই হোক আবার মূল কথায় ফিরে আসি। লিখতে গিয়ে এতো আবেগিক হয়ে পড়ছি যে কোন কথাটা লিখব না বুঝতে পারছি না। শ্বশুরবাড়ীতে অনেক কষ্ট করে থাকতে হত। তবে ওরা আমার নাচ বন্ধ করেননি এবং পড়াশুনাও করতে দিয়েছিলেন। আমি তখন ক্লাস এইট এ। শ্বশুরবাড়ীতে একটা রুমে নাচ শেখাতাম। নীহারেন্দ্র চৌধুরীর (নান্টুমামার) বাড়ীতে ওনার মেয়েকে নাচ শেখাতাম। আর অন্য নাচের ক্লাসও করাতাম। মামা আমায় এত আদর করতেন যে আমার মুখ দেখেই বলতে পারতেন আমি ভাত খাইনি। মামীকে ডেকে আমায় খাওয়াতে বলতেন। প্রায়ই ওদের বাড়িতে খেতাম। ডঃ মৃদুল চৌধুরীর বাড়িতে ওনার মেয়ে চৈতিকে নাচ শেখাতে যেতাম, চৈতির মা মিনুবৌদি ভালো কিছু রান্না করলেই আমার জন্য রেখে দিতেন। কিছু দরকার হলে এনে দিতেন। আমি আমার সুখ দুঃখের কথা বৌদির সাথে গল্প করতাম। আজও মনে আছে লালাবাজারে গৌতম রায় ফ্যানস্ ক্লাব এর এক অনুষ্ঠানে ওপেনিং ডান্স আমাকে দিয়ে করানো হয়েছিল। সেদিন নাচের যে পোশাক দরকার ছিল, সেটা কেনার ক্ষমতা আমার ছিল না। বৌদিই নিজে নিয়ে গিয়ে

কিনে দিয়েছিলেন। আজ আমার ওয়াড্রবে শাড়ী রাখার জায়গা নেই।

ওই সময় কত্থক নাচও শিখতে শুরু করি, যদিও পরে ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায়। এরপর লালাবাজারের একটি বিশাল অনুষ্ঠান হয় এবং টপ টেনকে নির্বাচিত করা হয়। সৌভাগ্যবশত আমিও ছিলাম ওই টপ টেন-এ। আরও একটু বড় হওয়ার পর শিলচরে দূরদর্শনের অডিশন দিই এবং পরবর্তীতে দূরদর্শনে অনেক অনুষ্ঠান করেছি Solo এবং Group এ। শিলচর দূরদর্শনের বিশেষ অবদান আছে আমার জীবনে। একদিন এক অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং এর পর প্রোডিউসার এসে খুব প্রশংসা করলেন এবং বললেন জীবনে আরও উন্নতি করতে। বাইরে কোথাও গিয়ে নাচ শিখতে। উনিই পরামর্শ দিলেন, গুরুজীর নাম ঠিকানাও দিলেন। আমি তখন দোটানায় পড়ে যাই, মাকে ছেড়ে এতদূরে কিভাবে থাকবো। কথাবার্তা চলছিল, ততই হাইলাকান্দিতে একটা ডান্স ওয়ার্কশোপ হয়েছিল। আমরা একশোর ও বেশী মেয়েরা জিতেন সিংহের কাছে নৃত্য প্রশিক্ষণ নেই। জিতেনদার নাচ দেখার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমিও জিতেনদার মত বড় শিল্পী হব। বলাবাহুল্য, সেই সময় হাইলাকান্দির আরেক নৃত্যশিল্পী রুমকী শান্তিনিকেতনে জিতেনদার কাছে বিশ্বভারতীতে নাচ শিখতো এবং খুব ভালো নাচ করত। একদিন এক অনুষ্ঠানে রুমকীর নাচের ঠিক আগেই আমার নাচ চলছিল, তখন একজন নৃত্যশিল্পীর মা বলে উঠলেন, "আমি তো রুমকীর নাচ দেখতে এসেছি", কথাটা আমার কানে আসায় খুব কষ্ট পেলাম। অনুষ্ঠানের পর বাড়িতে এসে খুব কাঁদতে লাগলাম আর মাকে বললাম শীঘ্রই আমাকে বাইরে পাঠাও। আমিও রুমকীর মতো বাইরে গিয়ে নাচ শিখতে চাই। মা প্রথমে রাজী ছিলেন না, পরে আমার কান্নাকাটি দেখে রাজী হলেন এবং উড়িষ্যাতে গিয়ে ওডিশি শিখতে পাঠানো হয় আমাকে।

দীর্ঘ তিন বছর একটানা রোজ সাত-আট ঘন্টা করে নাচ প্রাক্টিস করি ও ওডিশি নৃত্যে মাস্টার্স করি। পাশাপাশি ওডিশি ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখি। যত সহজে লিখলাম এই জার্নি তার চাইতে অনেক কঠিন ছিল। তবে পরবর্তীতে গুরুজীর নয়নমনি হয়ে উঠি। ওডিশি নৃত্য শেখা শেষ হওয়া মাত্র জিতেন সিং শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের ছাত্র ছাত্রীদের ছয় দিনের ওডিশি নৃত্যের কর্মশালায় নৃত্য প্রশিক্ষক হিসাবে যোগ দিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানান। যে শান্তিনিকেতনে নাচ শিখার জন্য যেতে চাইলাম, সেখানে নৃত্য প্রশিক্ষণ দিতে যাওয়া ছিল স্বপ্নপূরণের অনুভূতি। তখন কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে থেকে কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক অনুষ্ঠান করি।

২০০১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুরী গ্রামে যেখানে নাচের উৎপত্তি হয়েছে, সেখানে অল ইন্ডিয়া ডান্স ফেস্টিভ্যালে পারফর্ম করার ডাক পেয়েছিলাম। পারফর্মেন্স এতো ভালো হয়েছিল যে তেলেগু পত্রিকায়

একজন রিপোর্টার লিখেছিলেন যে "সোনালী আচার্যের নৃত্য দেখে মনে হচ্ছিল অজন্তা ইলোরার অচল মূর্তি যেন সচল হয়ে মঞ্চে চলে এসেছে।" সেই অনুষ্ঠানে কয়েকজন তেলেগু সিনেমার ডাইরেক্টর ও প্রোডিউসার ও ছিলেন। তারা আমার নাচ দেখে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পরের দিন আমার সাথে দেখা করে তেলেগু মুভিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। আমি ভাবলাম যে এটা একটা বিশাল সুযোগ, আমি যদি অভিনয়ে সুনাম অর্জন করতে পারি তাহলে নাচের দিকেও উন্নতি করতে পারব। তাই ওদেরকে বললাম বাড়ী গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে ফিরে আসব। তখন আমি দু-তিনটা নাচের স্কুল চালাতাম। সব বন্ধ করে আসতে হবে। ওরা বললেন ফিরে যাবার আগে একটা ফটোশুট করিয়ে নাও। তাই করলাম।

হাইলাকান্দি ফিরে এসে ছাত্রদের বলে নাচের স্কুল বন্ধ করে হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যেদিন হায়দ্রাবাদের বিমানে বসবো সেদিন ফোন করলাম যিনি হায়দ্রাবাদের আসতে বলেছিলেন। বাড়ি থেকে যখন ফোন করেছিলাম তখন ওনার ফোন বাজছিল কিন্তু রিসিভ করেননি। আমি ভাবলাম কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে আরেকবার কল করে কথা বলে নেব যে আমি আসছি হায়দ্রাবাদে। রাত এগারোটায় পৌঁছাবো। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে এয়ারপোর্টে নিতে আসবেন বা কাউকে পাঠাবেন। কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যখন তার ফোনে ফোন করলাম তখন সুইচ অফ্। ভয় পেয়ে গেলাম, কোথায় যাচ্ছি, ফ্লাইট থেকে নেমে এত রাতে কী করবো? মাকে আর এসব কতা জানাইনি। ভাবলাম যা হবে দেখা যাবে। আগের যাত্রায় ফটোশুটের দিন একটা গার্লস্ হোষ্টেলের নম্বর নিয়ে রেখেছিলাম। ডায়েরী বের করে ওই নম্বরে কল করলাম। রাত এগারোটায় ফ্লাইট যথারীতি ভাবে হায়দ্রাবাদে নামলো। ফ্লাইট থেকে নেমে হায়দ্রাবাদের মাটিতে ছুঁয়ে প্রণাম করলাম আর মনে মনে বললাম, "মা তোমার দেশে এসেছি, আমাকে মানে সম্মানে বাড়িতে ফেরত পাঠিও।" সঙ্গে ছিল ভগবদগীতা, লর্ড জগন্নাথ আর একটা সুটকেস। এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখি কই! কেউ তো আসেনি। তাকে অনেকবার কল করার চেষ্টা করলাম। তখন পর্যন্ত ফোনটা বন্ধ। গার্লস্ হোষ্টেলের নম্বরে কল করলাম। এক ভদ্রমহিলা রিসিভ করলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম, তারপর সব বিবরণ বললাম আর রুম আছে কি না জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন একটা রুমে একটা বেড আছে। আসলে থাকতে পারব। একটু স্বস্তি পেলাম। রাত সাড়ে বারোটা, কিছুই চিনি না। ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে আর কোথায় আসব? তিনি অটো করে চলে আসতে বললেন। তখন হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্ট শহরের মধ্যেই "বেগমগেট" এ। ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে একটা অটো ডেকে বসলাম। জগন্নাথকে বুকে জড়িয়ে রাখলাম আর মনে মনে ডাকতে থাকলাম যে প্রভু তুমি আমায় রক্ষা করো। বিশ পঁচিশ মিনিটেই হোষ্টেলের সামনে পৌছে গেলাম। হোষ্টেলের সাইনবোর্ড দেখে যেন শান্তি পেলাম। একজন ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে একটা অন্ধকার রুমের আলো জ্বালিয়ে বললেন এটা তোমার রুম। রুম দেখে, রুমের বেড দেখে আমার তো চোখ চড়কগাছ। ওই বেডে ঘুমাবো কী। আমি বসতেই পারলাম না এত নোংরা। ছোটবেলা থেকেই মায়ের আদরে আমি একটু মহারাণী টাইপের। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর কোয়ালিটি ভালো লাগে। ভদ্রমহিলা তো রুম দেখিয়ে চলে গেলেন। আমি সারারাত স্যুটকেসের উপর বসে কাটালাম। খুব ভোরে হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম সকাল হলে কোথায় যাব? তখনই এক হকার পেপার দিতে এসেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম আশে পাশে আর কোথায় হোস্টেল আছে। ও বলল নিউজ পেপার খুলে চেক করুন, পেয়ে যাবেন। সত্যি তাই করলাম। নিউজ পেপারটা খুলে কিছু গার্লস্ হোষ্টেলের নম্বর পেলাম। পাশে একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে কয়েকটা নম্বরে ফোন করলাম। আর ভাগ্যবশত একটা রুমও পেয়ে গেলাম।

তবে দুর্দশা তখনও শেষ হয়নি। হোষ্টেলে আসার দুদিন পরই আমার হোষ্টেলের খাবার খেয়ে ডায়েরিয়া হয়ে যায়। বারো হাজার টাকা হাতে নিয়ে এসেছিলাম। তিন-চারদিনের মধ্যেই প্রায়সব টাকা চিকিৎসার জন্য শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো সংগ্রাম বলতে পারেন জীবনযুদ্ধ। মাকে কিছু বলতে পারছিলাম না, কারণ হয়তো ভয় পেয়ে যাবেন আর আমাকে হাইলাকান্দিতে ফিরে যেতে বলবেন। একটু সুস্থ হয়ে যে স্টুডিওতে ফটোশুট হয়েছিল সেই স্টুডিও নটরাজ ভাট-তে আবার গেলাম এবং সব ঘটনা খোলে বললাম। তিনি চিন্তা না করতে বললেন। আর কিছুদিন তার কাছে মডেলিং এর কাজ করতে বললেন। একটু স্বস্তি পেলাম। চার-পাঁচদিন পর যে মুভিতে অভিনয়ের জন্যে ডাক পাই সেই ডাইরেক্টর আর নটরাজ ভাট আমার সাথে দেখা করতে হোষ্টেলের সামনে আসেন। আমি তো এত রেগে ছিলাম যে তার সাথে কথা বলার ইচ্ছেও ছিল না। তবুও হ্যালো বললাম। আমি কিছু বলার আগেই উনি আমাকে 'স্যরি' বললেন আর না আসতে পারার কারণটা বললেন। কারণটা ছিল উনি ছিলেন দূরদর্শনে প্রোডিউসার, তাই দূরদর্শনের শুটিং করতে ভাইজাগ আড়াকুতে চলে গিয়েছিলেন।

আর সেখানে থাকায় ফোনে সিগ্‌নাল ছিল না। যাক্ "It's ok" বললাম। তিনি পরদিন আমাকে অফিসে এসে কথা বলতে বললেন। কথামত আমি পরেরদিন হায়দ্রাবাদ দূরদর্শনে গিয়ে দেখা করি। তিনি বললেন প্রথমে একটা দূরদর্শনের প্রোগ্রাম করো। তাই করলাম। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্য নাট্যকে তেলেগুতে অনুবাদ করে হায়দ্রাবাদ দূরদর্শনে পরিবেশন করি। ড্রামাটা অনুবাদ করার জন্য বিশ্ব ভারতী থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের পর তিনি বললেন যে সিনেমার জন্য আমাকে ডেকেছিলেন, সেটা শ্যুটিং এর ডেট পিছিয়ে গেছে প্রায় ছয় মাস। মাথায় আরেকটা বাজ পড়লো। তবুও হাল ছাড়িনি। ভাবলাম এই ফাঁকে একটা ডিপ্লোমা করে নেই। হায়দ্রাবাদে খোঁজ নিলাম এবং জানতে পারলাম হিন্দীতে কোন এক্টিং শেখানো হয় না। ডিপ্লোমা করতে হলে মুম্বাই যেতে হবে। ডিসিশন্ নিলাম বম্বে যাওয়ার। আবার বাড়ী ফিরে গিয়ে মাকে আর মামাতো ভাইকে নিয়ে মুম্বাইতে এক্টিং ডিপ্লোমা করতে গেলাম। ছয় মাসের ডিপ্লোমা করলাম প্রফেসর রোশন তানেজা স্যারের কাছে। আবার ফিরে এলাম হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ আসার পর মুভির ডাইরেক্টর, প্রডিউসারদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তারা ইন্টারভিউ নিলেন আর সঙ্গে প্রস্তাব রাখলেন যে আমি ওদের জন্য কী করতে পারবো। উত্তরে বললাম যে কম টাকায় কাজ করতে রাজী আছি আর হার্ডওয়ার্ক করবো। ওরা বললো, না আরও কিছু, আমি বললাম, স্যরি এক্টেস হতে এসেছি, মেট্রেস নয়। মুভিতে কাজ করার জন্য ইচ্ছেটাকে বিসর্জন দিয়ে বুঝে নিলাম যে মাঠটা আমার জন্য নয়, আমি এর জন্য নই। পরে কিছু তেলেগু সিরিয়ালে যেখানে সম্মানের সাথে কাজ পেয়েছিলাম, সেখানে করেছিলাম। যেমন - "কুটুম্বরাও কুটুম্বরম্" "এবরু শোলা ওয়ার্লুদী", "ভক্ত পোতনা", "চেন্নাই এক্সপ্রেস" শর্ট ফিল্ম, আরো অনেক।

সব সময় কাজ থাকে না, তাই একটা স্কুলে চাকরি নিলাম। আর রেডিড ল্যাবস্ এর কাল্‌চারাল ইনস্টিটিউট সপ্তপর্ণীতে অনেক বছর নাচ শেখালাম। ২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদের বেস্ট ডাইরেক্টর কে. বিশ্বনাথ স্যার এর "শুভ প্রদম" সিনেমাতেও কাজ করেছিলাম তারপর ২০১২ সালে "গিনেস ওয়ার্ডল রেকর্ড" করলাম ১২৫ জন নৃত্যশিল্পী, ২৫ সঙ্গীত ও বাদ্য শিল্পী, মোট ১৫০ মিলে রেকর্ডটা করেছিলাম। অনুষ্ঠানটিতে মোট খরচ হয়েছিল ২৯ লক্ষ টাকা। আমি একটা নন-তেলেগু বাঙ্গালি মেয়ে হয়ে তেলেগু রাজ্যে এতো বড় প্রোগ্রাম আয়োজন করাটাই ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের। কথা প্রসঙ্গে বলি হায়দ্রাবাদে সিরিয়ালে কাজ করার সময় তেলেগু ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখি। ২০১৩ সালে করেছিলাম "জন গণ মন" জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) এর ১০০ বছর উদ্‌যাপন। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখার্জী তার দল নিয়ে এসেছিলেন পারফর্ম করতে।

২০১৪ সালে প্রথম সুযোগ পেলাম আমেরিকায় পারফর্ম করার। তারপর আরও দুবার অনুষ্ঠান করতে গেছিলাম লসএঞ্জেলস্ ও নিউইয়র্কে। লসএঞ্জেলস্ এ "নৃত্য ময়ূরী" এওয়ার্ড পেয়েছিলাম। প্রাসঙ্গিক একটা ঘটনা বলি। নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে সেখানে এয়ারপোর্টে আমায় ডিটেইন করে। কেননা আমার সাথে প্রচুর অলঙ্কার ছিল। আর প্রায় সবটাই আমার গায়ে আর সেগুলো নাচের জন্য ব্যবহার করতাম। নিরাপত্তা রক্ষীরা আমায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি ওদের বলি আমার পরিচয়। ওরা ইন্টারনেটে সার্চ করে কনফার্ম হয় এবং আমায় যেতে দেয়। সেই যাত্রায় ফেরার সময় ফ্লাইটে বসে আছি। হঠাৎ করে ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট এনাউন্স করে যে "আমরা প্রাউড, আমাদের মধ্যে আছেন ওয়াল্ডের গিনেস রেকর্ড করা সোনালী আচার্য"। সবাই ক্রমাগত হাততালি আর অভিনন্দন জানাতে থাকে। এই আকস্মিক সারপ্রাইজে আমি অভিভূত হয়ে যাই। চোখে জল চলে আসে, আনন্দে, গর্বে। ওরা আমায় সার্ব করে বাঙ্গালী ভাত মাছ। এ অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয়।

২০১৪ সালে বাংলাদেশেও অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং "সিলেট রত্ন" এওয়ার্ড পেয়েছিলাম। ২০১৭ সালে আবার আমেরিকায় শ্রীহট্ট সম্মিলনীতে ক্লাসিকেল ডান্স করেছিলাম। আমেরিকা থেকে ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই ছিল ইউ.কে. এবং ইউরোপ ট্যুর। আবার নেদারল্যান্ড. দুবাই, সুইজারল্যান্ড, প্যারিস, লন্ডনে পারফর্ম করেছিলাম। লন্ডন এম্বেসীতে আমাদের পুরো দলকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

হায়দ্রাবাদে দীর্ঘদিন ডান্স আকাডেমী চালিয়েছিলাম যা করোনার সময় থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখি। ২০১৩ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাই। বাঁ হাঁটুতে ছোট লাগে এবং অপারেশন হয়। তারপর থেকে নাচ করতে কষ্ট হয়। ডাক্তার বলে নাচ কন্টিনিউ করলে হুইল চেয়ারে বসতে হবে পরবর্তী জীবনে। আমি মনে করি নৃত্যশিল্পী নৃত্য থেকে বিরত থাকার বদলে মঞ্চে মৃত্যু হলেও জীবন সার্থক। সেই জেদ থেকে নাচ ছাড়তে পারি না। প্রতিবছর বিদেশ দেখে প্রচুর প্রোগ্রামের ডাক আসে। সব আগ্রহ্য করলেও ২০২৩ এ জাপান থেকে আসা আমন্ত্রণ ফেরাইনি। কেননা এটা আমার স্বপ্নের তালিকার শীর্ষে ছিল। রবীন্দ্রনাট্য করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। অনুষ্ঠানটি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। আমায় ওরা জাপানে পাকাপাকি ভাবে থাকার অনুরোধ করে।

শিল্পীর কাছে তার শিল্পসত্তা বেঁচে না থাকাটা মৃত্যুর বরাবর। যেহেতু নাচ করতে খুব কষ্ট হয়, তাই আবার শূন্য থেকে শুরু করলাম অন্য শিল্পকে নিয়ে বাঁচার। শুরু করলাম ছবি আঁকা আর গান শেখা। ২০২৪ সালে লর্ড বালাজীর এগারো ফুট তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং সাত ফুট তিন ইঞ্চি প্রস্থের পেইন্টিং তৈরী করে ৫৪ টি বিশ্বরেকর্ড গড়ি। আপনাদের সবার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে যেন ভবিষ্যতে নিজেকে ভালো অঙ্কন শিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

(লেখক - সোনালী আচার্য্য)

হোমেন বরগোহাঞির কলম

আমি ত্রিশ বছরের হয়ে থাকবো

নিশুতি মজুমদার

১৯৭৮ সালের কথা। কোনো এক সেমিনারে যোগ দিতে পুরী গিয়েছিলাম। যে সেমিনারে যোগ দিতে কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বি, এন রেলওয়ে হোটেলে। দু'জন লেখক একসঙ্গে কয়েক দিন থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই একজন অন্যজনের মনের কথা জানার চেষ্টা করবেই। তার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেক কথাতেই যতেষ্ট মিল আছে। অর্থাৎ দু'জন বন্ধু হতে পারি। পুরীতে একসঙ্গে থাকা দিনগুলিতে আমরা প্রাণখুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য বা সময় কাটানোর জন্য আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বক বক করেছিলাম। আসলে আমরা দু'জন এতই সল্পভাষী ছিলাম যে ঘন্টায় কখনো বা আমাদের মধ্যে মাত্র চার পাঁচটি বাক্যের বিনিয়ম হয়েছিল। বাক্যগুলির মাঝে মাঝে বিরাজ করতো গম্ভীর দীর্ঘ নীরবতা। সেই নীরবতার অবকাশে আমরা একে অন্যের অভিজ্ঞতার তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি - একদিন সুনীল আমাকে জিজ্ঞাসা করলো 'সাগর আর পাহাড়' - এই দু'দোর মধ্যে কোনটি তোমার বেশি প্রিয় ? আমি বললাম - সাগর আমার বেশি প্রিয়। কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি নদী। পৃথিবীর সব জিনিসের মধ্যে নদীই আমার সবচেয়ে প্রিয়। নদীর মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার গ্রামের নদীটি 'চারকড়িয়া' যার অপরূপ প্রেমের স্মৃতিতে আমার সমস্ত জীবন ভরে রেখেছে।

সুনীল কিছু সময় নীরব হয়ে থাকলো। তারপর মুখের ভিতরে বলার মতো করে বললো - 'আমাকে চার কাড়িয়ার' কথা বলো। আমি বললাম - সুনীল এবার অনেক সময় ধরে চুপচাপ থাকলো। তারপর বললো - 'নদী আমারও বড় প্রিয়। আমি একদিন তোমার 'চার কাড়িয়া' দেখতে যাব। জানো হোমেন, - 'Once I made love to to river' এরপর এক বিশাল নীরবতায় আমাদের দুজনকে গ্রাস করেছিল।

উপরের কথাগুলি কেবল মাত্র ভূমিকা। আসলে যে প্রসঙ্গ বলতে যাচ্ছি তা একেবারে আলাদা। একদিন আমি কথা প্রসঙ্গে সুনীলকে প্রশ্ন করলাম - 'তুমি সমস্ত জীবন ধরে যতগুলি বই পড়েছ তাদের মধ্যে এমন এক বই এর নাম করতে পারবে যার একটি বিশেষ বাক্য বা পেরাগ্রাফ তোমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে আছে? ইংরাজীতে বলতে গেলে সে বাক্য বা বাক্য সমষ্টি তোমাকে hunt করে থাকে।'

ভাবার জন্য এক মিনিট সময়ও না নিয়ে সুনীল বললো 'পুতুল নাচের ইতিকথা' নিশ্চয় পড়েছ ? শশী যে একদিন সন্ধে বেলা গ্রামের প্রান্তে টিলা একটিতে ওঠে সূর্যাস্ত দেখেছি - মনে আছে সেই প্যারাগ্রাফটি ? পুতুল নাচের ইতিকথা যে পড়েছে সে জীবনে ভুলতে পারবে কি সেই বাক্যগুলি?'

সুনীলের কথা শুনে মনে মনে আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম। বহু বছর পূর্বে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রথমবার পড়ার দিনটির কথা আমার মনে আসলো। সুনীল বইটির যে প্যারাগ্রাফটির কথা বলছিল আমি সেদিন এক প্রবল আবেগের আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে এক মুহুর্ত থমকে যাওয়ার মতো আমিও বইটির সেই জায়গায় মুহুর্ত নয় অনেক সময় ধরে থমকে রয়েছিলাম। শশীর চোখে দেখা সেই অবির্বচনীয় সূর্যাস্ত এবং জীবনের ওপর তার গভীর অর্থপূর্ণ আলোকপাত ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনের আকাশে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক সে জন্যই তো আমরা বই পড়ি। জীবনের অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং পরম রহস্য কোনো একজন মানুষের পক্ষে জেনে শেষ করা সম্ভব নয়। বই পড়ে আমরা জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা জানতে পারি এবং তা করে জীবনকে নিত্য নতুন রূপে আবিষ্কার করে থাকি। আমরা জীবনের নতুন নতুন রূপ আবিষ্কার করি ততই জীবনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়ে যায়। সাহিত্য এবং শিল্পকলায় এভাবেই জীবনকে আমাদের জন্য অধিক উপভোগ্য এবং অর্থপূর্ণ করে তোলে।

সেদিন সুনীলের সঙ্গে হওয়া কথাবার্তার কথা মনে পড়লেই আমি নিজেকে প্রশ্ন করি - জীবনে এতগুলি অসমীয়া বই পড়েছিস তার মধ্যে এমন কোনো একটি বাক্য বা প্যারাগ্রাফ নেই নাকি যা আমার মনের কোন এক কোনে এখনো গাঁথা আছে ? (আমি এখানে শুধু গদ্য রচনার কথাই বলছি।) একেবারেই নেই বলে বলতে পারি না। 'জীবনর বাটত' উপন্যাসে অংকিত কয়েকটি দৃশ্য, লক্ষীধর শর্মার গল্প এবং একাধিকার কোনো কোনো বাক্য রমা দাশের 'বর্ষা যেতিয়া নামে' এবং কৃষ্ণ ভূঞার 'বকুর ছবি' নামের গল্পের কয়েকটি প্যারাগ্রাফ, এই সব ছিল আমার যৌবনকালের আত্মার আহার। যে সব উপাদানের সাহায্যে এক কিশোর বা সদ্য যুবক তার অলৌকিক দিবাস্বপ্নের নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি করে নেয়, সে সব উপাদান আমি সংগ্রহ করেছিলাম এই লেখকদের কাছ থেকে। সে সব রচনা আবার পড়লে আমি এখনও যৌবনকে ফিরে পাওয়ার মতো অনুভব করি। তারপর যৌবনটা হল a state of mind, মনের এক অবস্থা মাত্র। পাবলো পিকাসোর নব্বই বছর বয়সের জন্মদিনে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে একজন যশস্বী সাংবাদিক বলেছিলেন - 'মহাশয়, আপনার নব্বই বছরের জন্মদিন উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।' উত্তরে পাবলো পিকাসো বলেছিলেন - 'আমার তো নব্বই বছর হয়নি। আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স, তখনই আমি ঠিক করেছিলাম যে - সমস্ত জীবন আমি ত্রিশ বছরের হয়ে থাকব। তাইতো আজ আমার বয়স ত্রিশ বছর।'

(সাংবাদিক হোমেন বরগোহাঞির এর মূল অসমীয়া রচনা থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন সাহিত্যিক নিশুতি মজুমদার)

<><><><><>

পরকীয়া ঃ কাঠগড়ায় কে ?

মহাশ্বেতা দেব

পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা অনেক জলঘোলা হয়েছে।সেসব প্রশ্নে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সরাসরি বলতে গেলে যে কোনো সম্পর্কে বিশ্বাস, ভরসা, যত্ন সবকিছু প্রয়োজন। যখন একটা সম্পর্ক সেগুলোর অভাব অনুভব করে তখনই তার মোড় ঘুরে যায়। পরকীয়াকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই সম্পর্কগুলো কয়েকটা জীবন তছনছ করে দেয়। তাই যতদূর সম্ভব এতে মত্ত না হওয়াই উত্তম সিদ্ধান্ত।কিন্তু এখন প্রশ্ন আসছে পরকীয়া সম্পর্ক গুলো ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এর কারন কি?এক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কারন মোবাইল ফোন আর সোশ্যাল মিডিয়া। এখন প্রশ্ন আসতে পারে এর আগে কি পরকীয়া ছিল না? হয়তো ছিল কিন্তু তার জোর এতটা ছিল না। এমন প্রলংয়করী রূপ ছিল না পরকীয়ার। আসলে পরোক্ষে এই কাজটা করছে সোশ্যাল মিডিয়া। এখানে তো কোনো বাধা নিষেধ নেই। আপনার সীমাবদ্ধতা যেখানে নেই সেখানে আপনি যখন তখন ছাপিয়ে যেতে পারেন সবকিছু। আগে আমাদের চেনার গন্ডী ছিল সীমিত। লোকলজ্জা সামাজিক ভয় কাজ করত। এখন এসব স্বাভাবিক হয়ে গেছে কবেই। আজকাল বেশিরভাগ মানুষই এসবের ধার ধারে না। সম্পর্ক গুলো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও আজ আর তেমনভাবে দেখা যায় না। তাই ডিভোর্স আর পরকীয়া দুটোর সংখ্যাই প্রচুর। এমন ভাবে একজন আরেকজনের প্রতি নির্ভরশীল হচ্ছেন বুঝতেই পারছেন না ভুল করছেন। কেউ ধরিয়ে দিলেও না। বউ বাচ্চা স্বামী মা বাবা সব সম্পর্কের বলি দিয়ে দিচ্ছেন প্রেমের নাম করে।অনেকে তো আবার পরকীয়াকে বৈধ বলছেন জোর গলায়। আমার প্রশ্ন যদি পরকীয়া বৈধ হয় তবে সামাজিক সম্পর্ক গুলো কি অবৈধ? পরকীয়া সম্পর্ক গুলো তৈরি হওয়ার অনেক কারনের মধ্যে একটি হচ্ছে দূরত্ব। মানসিক দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একটা সম্পর্ককে ফোকলা করে দেয়। তখন

অন্য একটা সম্পর্ক বা নতুন কিছু পাওয়ার আশায় পরকীয়ার জন্ম হয়। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল পরিসংখ্যান অনুযায়ী পরকীয়া সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি হাই সোসাইটিতে। আর হওয়ারই কথা। কারণ এখানে সময়ের অভাব। হাই প্রোফাইল বর বউ দুজনেই চাকরি করেন হয়ত। দিন শেষে রাতে একবার যদিও বা দেখা হয় তখন তেল নুন চিনির হিসেব আর ইচ্ছে হলে একটা যান্ত্রিক শারীরিক মিলন। এখানে তাদের করনীয় কিছুই নেই। সম্পূর্ণটাই সময় এবং ব্যক্তি নির্ভর। কারন যদি সেই দম্পতি ভাবেন এতো কিছুর পরও একটা রোববার যেন দুজনের হয়। কিছু না পাওয়ার গল্প হোক। হাতে হাত থাকুক। কিংবা জড়িয়ে ধরে একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমানো যাক। তবে কিন্তু বুঝতে হবে তাদের সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়নি।আর সেই ওম থেকেই তাদের সম্পর্ক টিকে থাকবে সুদীর্ঘ কাল।কিন্তু দুজনের একজনও যদি অন্য কারো সাহচর্য পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবেই শেষের শুরু। এক্ষেত্রে নিজের বিবেক বিচার বোধকে কাজে লাগাতে হবে। বুঝতে হবে যেকোনো সম্পর্ক নিজের জায়গায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেটাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মানেই তো আপনি মানুষ হিসাবে সুস্থ নন। আপনার মনোবৃত্তি ভালো নয়। আপনি একজনকে ঠকাবেন আর ভাববেন আপনি ভালবাসা বিলাচ্ছেন তা তো সম্ভব নয়। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে একজন ছেলে বা মেয়ে একটু সংযমী হলেই এধরণের বহু সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই গুড়িয়ে দেওয়া যাবে।তার জন্য চাই সদিচ্ছা।আপনার চেনার গন্ডী খুব বেশি বা ক্ষমতা আছে টাকার গরমও রয়েছে। তাই বলেই আপনি পরকীয়া করবেন এমন কোনো কথা নয়। একটা সুস্থ সম্পর্কে জড়ান যেখানে লুকানোর দরকার নেই।কারো কাছে কিছু আড়াল করার প্রয়োজন হবে না।সম্পর্কের সমীকরণ জোড়া লাগানো শেখায়।অন্যকে সরিয়ে নিজের মাথা গলিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমার মনে হয় সম্পর্ক পরকীয়ায় নয় বাঁচুক যত্নে, ভরসায়, আদরে আবদারে। আমাদের চারিদিক ভালো হলেই তো আমি আপনি আমরা ভালো থাকতে পারব।

<><><><><><>

জীবনের ঘূর্ণিপাকে

হিফজুর রহমান লস্কর

সুবোধ ও সত্যেন একই শ্রেণীতে পড়ে। সুবোধ পড়াশুনায় খুব ভাল। প্রতি বৎসর ক্লাসে প্রথম হয়। আর সত্যেন? মা বাবার একমাত্র আদরের ছেলে। শুধু স্কুলে যাওয়া আসাই সার। যেন স্কুল একটা টাইম পাসের জায়গা। কথায় বলে " সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' কিন্তু এদের বেলায় ঠিক বিপরীত। সত্যেন সুবোধের সাথে বন্ধুত্ব রাখে শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য। রোজই সে সুবোধকে কত কিছু কিনে খাওয়ায়। তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাশে বসে পাশ করার জন্য। কিন্তু এভাবে কতদিনই বা চলে? অষ্টম থেকে দশম, তারপর মাধ্যমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষায় সুবোধ প্রথম বিভাগে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করে আর সত্যেন ফেল করে বসে। কারণ এবার আর দুজন একসাথে বসে পরীক্ষা দিতে পারল না। বাবার আদরের ছেলে সত্যেনের পড়ার এখানেই ইতি টানতে হল। অবশ্য আরও দু তিন বার সে পরীক্ষায় বসেছে কিন্তু পাশ করা আর হয়ে উঠলো না। শুরু হলো ওর ভবঘুরে জীবন।

অন্যদিকে সুবোধ মাধ্যমিক পরে উচ্চ মাধ্যমিক তারপর বি এ পাশ করে এরপর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। যদিও দুজন দুই মেরুতে, তাদের সম্পর্কে কোন চিড় ধরেনি। অবসর সময়ে ঠিক আগের মতোই হাসি ঠাট্টা, একসাথে চলাফেরা যেন কোথাও কোন তফাৎ নেই। একে অপরকে পুরো বিশ্বাস করতো আর মনের কথা খুলে বলত।

ইউনিার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সুবোধের একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। মেয়েটির নাম লিলি। দুজনে প্রথমে হয় বন্ধুত্ব। তারপর ধীরে ধীরে সম্পর্কটা গভীর হয়ে যায়। সুবোধ গরীব ঘরের ছেলে। আর লিলি? সেতো ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষের মেয়ে। বাবা কোটিপতি। নিজে কার চালিয়ে যখন তখন বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিন সে সুবোধকে গাড়িতে বসিয়ে পার্কে চলে যায়। সেখানে বসে কথা বলতে বলতে একসময় লিলি সুবোধ কে খোলাখুলি বলেই ফেললো, জানো সুবোধ " আমার স্বপ্ন শুধুই তুমি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।"

সুবোধ ভয় পেয়ে যায়। " এ কী কথা? কোথায় তুমি আর কোথায় আমি! এটা কোনোদিনই সম্ভব না। তোমার বাবা যদি জানতে পারেন আমাকে শেষ করে দেবেন। লিলির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। বলে" তা হলে তুমি আমাকে মেরে ফেলো।" বলে ওর হাত দুটো টেনে নিজের গলায় চেপে ধরলো। সুবোধ কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। অযথা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বলে " আজ আমার খুব তাড়া আছে। চলো যাই, কাল কথা হবে।

সেদিন রাতে সুবোধের ঘুম হয়নি। বার বার লিলির ওই কথাটিই ওর মনে পড়ছিল,"তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব ন!" নিজের অজান্তে সেও লিলিকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু তার গরিবী যে এ ভালোবাসার অন্তরায়। ভাবতে ভাবতে তার মনটা ভারী হয়ে উঠলো। ভাবলো সত্যেনকে সে কথাগুলো বলবে, তাতে যদি কোন উপায় হয়, যদি মনটা হাল্কা হয়।

পরদিন সকাল সকাল সে সত্যেন এর সাথে দেখা করে সমস্ত কথা খুলে বললো। সত্যেন সব শুনে বললো' চিন্তার কোন কারণ নেই। সে যখন তোকে এত ভালোবাসে সে নিজেই ওর মাবাবাকে ম্যানেজ করবে। এমন মেয়ে তুই হাতছাড়া করিস না।'

সত্যেন এর কথায় সে একটু আশ্বস্ত হল। তার মনটা একটু হাল্কা হল। বললো " বন্ধু তুই এখন থেকে আমাকে একটু সঙ্গ দিবি। একমাত্র তুইই আমার ভরসা। আজ বিকাল চারটায় ওর সাথে দেখা করার কথা। তুই আমার সঙ্গে যাবি। সত্যেন তার কথায় রাজী হল।

বিকেল চারটায় দু'বন্ধূ মিলে লিলির সাথে পার্কে দেখা করতে গেল। সেখানে লিলি আগে থেকেই বসেছিল। সুবোধ লিলির সাথে সত্যেনের পরিচয় করিয়ে দিতে লিলি থতমত খেয়ে গেল। সত্যেন ঠোঁট বাঁকা করে কপট একটা হাসি দিয়ে বললো" ও এই বুঝি তোর লাভার, উনাকে তো আমি অনেক আগে থেকেই চিনি। উনিতো বিশ্বম্ভর বাবুর আদরের মেয়ে"। যাই হোক পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ভালোই হল। তুই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর এই সুবাদে লিলিও আমার ফ্রেন্ড হয়ে গেল।

লিলি মাথা নিচু করে বসে আছে। মনে মনে ভাবল ভালো না ছাই। ওর মনে পড়ল, একসময় এই সত্যেন তার সাথে সম্পর্ক করার জন্য কী না করেছে।

সে তো বেশি দিনের কথা নয়। সত্যেন এর বাবার ট্রান্সফার হয়েছিল লিলিদের শহরে আর ওরা থাকত লিলিদের পাশের বাসায়। লিলিকে দেখে একে একে সব কথা সত্যেনের মনে পড়ল। লিলিকে পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টাই সে বাকি রাখেনি। অথচ সেই লিলি আজ সুবোধ এর মত একটা গরীব ঘরের ছেলের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে।

সে মনে মনে ফন্দি আঁটে এদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বন্ধুত্ব করবে আর সময় সুযোগে যেমন করেই হোক লিলিকে তার চাই। কেউ কথা বলছে না। সুবোধই নীরবতা ভঙ্গ করল, 'এই চল আমরা ওখানে গিয়ে বসি।'

তারা তিনজন আরাম কেদারায় গিয়ে বসল। অনেক্ষণ ধরে সেখানে তাদের কথোপকথন চলল।

এই ভাবে দিনের পর দিন একসাথে দেখা সাক্ষাৎ, চলা ফেরা আলাপ আলোচনায় তাদের সখ্যতা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে লিলি ভুলে গেল সত্যেন যে এক সময় তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কী না করেছে। তখন সে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে সহ্য করতে পারতো না। অথচ এখন এমন হয়েছে যে একদিন সত্যেন এর অনুপস্থিতি সুবোধ ও লিলি দু জনেরই সহ্য

হয় না।

এ ভাবে আরও দু তিন বছর অতিক্রান্ত হল। লিলি ইকোনোমিক্স বি এ অনার্স পাশ করল। বিশ্বম্ভর বাবু এ বছর ঘটা করে মেয়ের জন্মদিন পালন করবেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাউকে নিমন্ত্রণ দিতে বাকি রাখলেন না। লিলিকে ওর সকল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করার জন্য বললেন।

লিলি সকল সহপাঠী ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করল।সুবোধ ও সত্যেনকে স্পেশাল ভাবে নিমন্ত্রণ দিতে ভুল করল না।

সুবোধ নিমন্ত্রণ পেয়ে লিলিকে বলল "আমার খুব লজ্জা হচ্ছে, কি নিয়ে যাবো, তাছাড়া পার্টিতে যাওয়ার মত আমার তেমন ভাল ড্রেস নেই।" লিলি কি বলতে যাবে এমন সময় সত্যেন বললো," সেটা আমি দেখবো, তোকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না।" সত্যেন লিলিকে আশ্বস্ত করল,"লিলি তুমি চিন্তা কর না, আমি ঠিক সময়ে ওকে নিয়ে হাজির হব।"

৫ ডিসেম্বর লিলির জন্মদিন। সবাই উপস্থিত। বার্থডে ক্যাণ্ডেল জ্বলবে, কেক কাটা হবে। লিলি বার বার ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে আর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। আজ যেন ওর বিশেষ কোন অতিথি আসছে। মা তাকে ডেকে বললেন,' কেক্ কাটার সময় হয়েছে,।' সে বলল আসছি মা, আরও দু একজন বাকি আছে।'

সবাই অবাক হয়ে অপেক্ষায়, কে সেই বিশেষ অতিথি যার জন্য লিলি অপেক্ষা করছে। সেই মুহূর্তে সুবোধ ও সত্যেন সেখানে এসে উপস্থিত। সত্যেন খুব বড় একটা পুতুল হাতে নিয়ে পাশে এসে দাড়ালো। সে জানতো লিলি পুতুল খুব ভালোবাসে। তারা যখন তাদের পাশের বাড়িতে ছিল, একদিন একটি বিড়ালের ধাক্কায় তার একটা পুতুল ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে দিন কি কান্না! ওই দিন সে ভাতই খায়নি। তাই ভাবলো লিলি পুতুলটা পেয়ে খুব খুশি হবে। কিন্তু আজ সুবোধের হাতে একটা ফুলের তোড়া দেখে সে যেন আত্মহারা। ' Waw! কী সুন্দর ফুল!' বলে ওটা হাতে নিয়ে মাকে দেখালো। সে সুবোধ ও সত্যেনকে মা-বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। বার্থডে ক্যান্ডেল জ্বালানো হল,কেক কাটা হল। সবাই একসাথে উইশ করলো 'হ্যাপি বার্থডে টু লিলি'। রেকর্ডে বার্থডে গান বেজে উঠল। খুব আনন্দ মুখর পরিবেশ। ছোট বড় সবাই গানের তালে তালে নাচছে। এরই মধ্যে হঠাৎ লিলির বান্ধবী পায়েল বলে উঠলো 'আজ লিলির কণ্ঠে গান শুনব।' সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে চেপে ধরল, গান শুনার জন্য। সুযোগ পেয়ে সত্যেনও বললো ' হাঁ শুনেছি লিলি গান গায়, কিন্তু নিজের কানে কোন দিন শুনিনি বা চোখেও দেখিনি। আজ তাহলে একটা গানশোনা যাক।'

সবার পিড়াপিড়িতে লিলি গান ধরলো

' আমার এ আঁধার জীবনে
আলো হয়ে দিলে জোসনা--,
তাইতো মনের গহীনে আছো
তুমি যেন ভুল বুঝোনা--।।

হীরা পান্না সোনা দানা
এজীবনে কভু আমি চাহিনা,
বকুলের মালা গেঁথে রেখেছি
তুমি যেন ভুল বুঝোনা--।।

ঊষার শরতে যদি কভু
আসে বারিধারা --
ভিজে যাবো সেথা আমি
তুমি শুধু ভুল বুঝোনা--।।

গান শেষে সবাই হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। গানের রেশ যেন আর থামতেই চায় না। অনেকক্ষণ চললো হাসিঠাট্টা। এবার লিলি আর তার মা-বাবা সকল অতিথিদের আপ্যায়ন করল। অতঃপর রাতের খাবার খেয়ে সবাই বিদায় নিল। শুধু সুবোধ ও সত্যেনকে লিলি পাশের ঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখল।

অন্যান্য সকল অতিথি চলে যাওয়ার পর লিলি ওর মা-বাবার সাথে দু বন্ধুকে নিয়ে খেতে বসল। খেতে খেতে সে এদের সম্মন্ধে কত কথাই না বললো । বিশেষ করে সুবোধের প্রশংসায় যেন সে পঞ্চমুখ। বিশ্বম্ভর বাবু কিছুটা আঁচ করতে পেরে বললেন,' তোমরা দুজনকে পেয়ে খুব ভালই হল। তোমরা দুজন সব সময় এসো বাবারা'। লিলি খুব খুশি ,তার মা বাবাও তাদের সম্পর্কের কথা জেনে গিয়েছেন। সুবোধ ও সত্যেন দুজনই লিলিদের বাড়িতে অবাধ আসা যাওয়া করে। লিলির মা-বাবা এ তিনজনের বন্ধুত্বে মুগ্ধ। তা হবে নাই বা কেন। একমাত্র লিলি ছাড়া আর কে ই বা আছে তাদের। সুবোধ ও সত্যেন দুজনকে পেয়ে যেন তাদের একাকীত্ব আরও কিছুটা লাঘব হল।

দিন গড়িয়ে যায়। সত্যেন কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায়। যেমন করেই হোক লিলিকে তার চাইই। চোখের সামনে বন্ধু সুবোধ ও লিলির ভালবাসা কতই বা সহ্য করবে? এদের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে তার ঘুমই হয় না।

সুবোধ কিন্তু আজ অব্দি লিলিকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা চিন্তাই করতে পারে না। সে জানে তাকে ছাড়া লিলি বাঁচবে না, তবু। সে গরীব, সে ওর উপযুক্ত নয়। যা সত্য তা তো মেনে নিতে হবে।

হঠাৎ একদিন রাতে সুবোধ ফোন পেলো লিলির বাবার স্ট্রোক হয়েছে। তাকে নিয়ে মেডিক্যাল যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে সত্যেনকে ফোন করে। দু বন্ধু এসে তাকে হসপিটাল নিয়ে গেল। লিলি ও তার মা সঙ্গে গেল। লিলির বাবাকে আই সি ইউ' তে ভর্তি করা হল। পরদিন ডাক্তার জানালেন তিনি এখন বিপদ মুক্ত। তবে উনার নিউোনিয়া হয়ে গেছে এবং পুরো কিওর হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। তাকে একটা কেবিনে অ্যাডমিশন দেওয়া হল।

এবার সবাই মিলে পরামর্শ করল, রোগীকে তো আর একা রাখা যাবে না। তাই পালা করে পাহারা দিতে হবে। সুবোধ ই প্রথমে বলল," মাসিমা আর লিলি আজ এখানে থাকবে'। কাল সকাল দশটায় সে আর সত্যেন এসে তাদের রিলিভ দেবে। সব কিছু বুঝিয়ে সমঝিয়ে তারা দু বন্ধু বাড়িতে চলে গেল।

পরদিন যথারীতি তারা এসে লিলি ও তার মাকে বাড়ি পাঠালো, আর বললো তাদের আর

রাতে থাকতে হবে না। পালা করে তারা দুজন এই ক'দিন রোগীর দেখাশোনা করবে। লিলি ও তার মা সুবিধা মত দিনে একবার এসে দেখা করে যাবে।

সিদ্ধান্ত হল প্রথম রাত সুবোধ সেখানে থাকবে। পরদিন সন্ধ্যায় সত্যেন এসে তাকে রিলিভ দিয়ে রোগীর পাশে থাকবে। এ ভাবেই চলল দু তিন দিন।

সেদিন সুবোধের পালা। তাই সুবোধকে রোগীর পাহারায় রেখে সত্যেন লিলি ও তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে চলে যায়। রাতে শুয়ে শুয়ে সত্যেনের মাথায় নানা চিন্তা এসে ঘোরপাক খেতে লাগল। এপাশ ওপাশ করতে করতে কোন অবস্থাতেই তার ঘুম আসছিল না। লিলির কথাই ভাবছিল। ওর জন্য সে কীনা করেছে, অথচ সে যেন তাকে পাত্তাই দেয় না। মনে হয় সুবোধই তার কাছে বেশি প্রিয়। ভাবতে ভাবতে মনে জ্বালা শুরু হয়ে গেল। ওর মাথায় এক কুবুদ্ধি আসলো। এতদিন থেকে লিলিকে পাওয়ার যে সুযোগ খুঁজছিলো আজ সে সুযোগটা হাতছাড়া করবে না। ভাবনাটা তাকে অস্থির করে তুলল। সে চলে গেল সেই হাসপাতালে। সেখানে পৌঁছে দেখে সুবোধ ঝিমোচ্ছে। রাত তখন সাড়ে বারোটা। চেয়ে দেখে রোগী ঘুমাচ্ছেন, তখনও অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগানো। অনেক্ষণ সত্যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অবস্থা নিরীক্ষণ করল। অনুমান করল সুবোধ ঘুমে আচ্ছন্ন। এই সুযোগে সে রোগীর অক্সিজেন সিলিন্ডার ডিসকানেক্ট করল এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিশ চাপা দিয়ে বিশ্বম্ভর বাবুকে খুন করে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

ভোর চারটার সময় সুবোধের ঘুম ভাঙলো। চেয়ে দেখে বিশ্বম্ভর বাবুর বিছানা পত্তর সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর হাত পা একেবারে সোজা। সিলিন্ডারটাও ডিসকানেক্ট। সমস্ত পরিস্থিতি আঁচ করে সুবোধের গা শির শির করে উঠল। কে এই কাজ করতে পারে? এখানে তো সে একাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে লিলি ও সত্যেনকে ফোন করল। ফোনটি রাখতেই হঠাৎ তার চোখ পড়ল মৃতের পাশে একটি মুচড়ানো কাপড়। হাতে নিয়ে দেখে এটাতো একটা রুমাল। এটা গত সপ্তাহে সে সত্যেনকে দিয়েছিল। এটা পেয়ে ওর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল, এ কাজ তাহলে সত্যেনের।

ফোন পেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি এখানে এসে পৌঁছলো। ইতিমধ্যে এখানে ভিড় জমে আছে। সত্যেন এসেই বললো এ কাজটা নিশ্চয়ই সুবোধের। রাত নিশিতে একমাত্র সে-ই তো একা এখানে ছিল। লিলিকে বিয়ে করে বিশ্বম্ভর বাবুর সম্পত্তির মালিক হবে এই লোভেই সে এ কাজটি করেছে। সত্যেনই বিশ্বম্ভর বাবুকে খুন করেছে।

ইতিমধ্যে থানা পুলিশও এখানে এসে গেছে। সুবোধ রুমালটি দেখিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু বলতে পারলো না। তার এই অব্যক্ত কথা ও বেদনা লিলি ঠিকই ঠাহর করে নিল। কারণ এই রুমালটির সাথে লিলির পরিচয় ছিল। সত্যেনের হাতে এ রুমালটি সে অনেকবারই দেখেছে।

লিলি সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে এই রুমালের কথা বলে সত্যেনের উপর যে সন্দেহ তা প্রকাশও করেছিল। কিন্তু তখন তার কথা কে ই বা শুনে?

মৃতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবচনায় এটা পরিকল্পিত মার্ডারই প্রমাণিত হল। মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করা হল আর সুবোধকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।

দু তিন দিন পর সত্যেন লিলিদের বাড়িতে দেখা করার জন্য আসল। লিলির মা অসীমা দেবী তখন আঙিনায় বসে কাজ করছিলেন। সত্যেন এসেই বলল,"মাসিমা লিলি কোথায়? ওই সুবোধের জন্য খুবই খারাপ লাগছে, বেচারা---।" অসীমা দেবী লিলিকে ডাকলেন। লিলি ঘর থেকে ওর কথাগুলি শুনছিল। বলল, "মা, ওকে বলে দাও চলে যেতে। আর কোনোদিন যেন এখানে না আসে। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।"

লিলির কথাগুলো যেন সত্যেনকে তীরের মত বিদ্ধ করল। সে বুঝতে পারল লিলি তাহলে তাকে সন্দেহ করছে?

সে অসীমা দেবীকে বলল," মাসিমা কোথাও যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ দিন রাতে যদি আমি বাড়িতে না আসতাম তাহলে হয়ত এমন অঘঠন ঘটতো না। প্রিয় বন্ধু সুবোধের এখন কি হবে ভেবে আমার বুকটা দুরুদুরু করছে। যদি ওর জেল হয়ে যায়?"

লিলি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। বেরিয়ে এসে বলল," ওর জেল হলে তাতে তোমার কি? তুমি তো তাই চাইছ। তোমার সাথে বন্ধুত্ব করাই ওর কাল হয়েছে।

সত্যেন অগ্নিশর্মা হয়ে বলল,"তুমি কি বলতে চাইছ? সুবোধ ছাড়া তো ঐ দিন ওখানে আর কেউ ছিল না। তুমি প্রেমে অন্ধ হয়ে গেছ, তাই যা তা বলছ।"

অবস্থা বেগতিক দেখে অসীমা দেবী মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন," তুই ভেতরে যা।" আর সত্যেনকে বললেন' তুমি অন্য দিন এসো। এই বলে তিনি লিলিকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সত্যেন মাথা নিচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বিচারে সুবোধের পনেরো বছরের জেল হয়ে গেল। শুনামাত্র লিলি হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠলো। পরদিন মা'কে নিয়ে সে সুবোধের সাথে দেখা করতে গেল। লিলি কোন মতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না, তার অন্তরাত্মা বলছে সুবোধ এরকম কাজ করতে পারে না।

জেলে দেখা করতে গেলে সুবোধ এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল " যা হবার তা হয়ে গেছে, আমি খুনের অপরাধী। তোমার দুটি হাত ধরে বলছি, তুমি আর কখনো আমার সাথে দেখা করতে এসো না।"

লিলি কাঁদতে কাঁদতে বলল," তুমি বলো তুমি খুন করনি।, আমি জানি তুমি খুন করতে পারো না। আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো। সুবোধ চট করে জবাব দেয়," না লিলি না। তুমি বিয়ে কর, সংসারী হও, আমার দিব্যি রইল, জীবনটা এমনি এমনি নষ্ট করো না।" কথা কটা শেষ হতে না হতেই জেইলার এসে লিলিকে বলল" দেখা করার সময় শেষ" লিলি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন সত্যেন লিলির সাথে ফোনে কথা বলতে চেয়েছিল। প্রথম দুই এক

দিন একটু আধটু কথা হয়েছিল , তাও লিলি এখন বন্ধ করে দিয়েছে।সত্যেনের সাথে সে কোন সম্পর্ক রাখতে চায়নি।

শেষ পর্যন্ত সত্যেন একদিন নিজের মা'কে পাঠিয়ে ছিল লিলিদের বাড়ি, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। লিলি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু তাই নয়, রীতিমতো অপমানিত হয়ে মা ফিরে এসেছেন। মায়ের এ অপমানের কথা শুনে সত্যেনের নিজের উপর রাগ হল। ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হয়ে নেশা পান করতে শুরু করলো। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগল। ওর জীবনটা বিষময় হয়ে উঠলো। কৃতকর্মের জন্য সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলো। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার মতো জায়গা পেলো না।

এদিকে লিলির বিয়ের বয়স হয়েছে। অনেক ভাল ভাল জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। মা অসীমা দেবী অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু ওর সোজা কথা, আমার ভাগ্যে বিয়ে লেখা নেই, আমি বিয়ে করবো না।"

মা জোর করে চেপে ধরলেন। বললেন" আমি আর কতদিন আছি, বয়স হয়েছে। তাছাড়া এখানে আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। তোর ভবিষ্যৎটা একটু চিন্তা কর।" লিলি বললো," না মা, তুমি একটুও ভেবো না। আমি কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েছি। একটা না একটা কিছু জব পেয়ে যাবো। তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না।"

হলোও তাই। হঠাৎ একদিন লিলি মা'কে বললো " মা একটা কোম্পানি আমাকে কল দিয়েছে , বেঙ্গালুরু থেকে। প্রাইভেট কোম্পানি। বছরে সাত লক্ষ টাকার প্যাকেজ। আমি গিয়ে জয়েন করে এক সপ্তাহ পর তোমাকে এসে নিয়ে যাবো।

মা একথা শুনে ভাবনায় পড়ে গেলেন। " কিন্তু তুই মেয়ে মানুষ, আর একা - ----?"

লিলি সাহস দিয়ে বললো" ওসব তুমি চিন্তা করো না, আমি পারবো।"

লিলি কোম্পানিতে জয়েন করলো।

যথারীতি এক সপ্তাহ পর যাবতীয় আসবাবপত্র সহ মা'কে এসে নিয়ে গেল।

এদিকে জেলে সুবোধ সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলো। একদিন সবাই তাকে চেপে ধরল, কোন অপরাধে তার মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত ছেলের জেল হলো। সুবোধ আদ্যপান্ত ঘটনা সবাইকে খুলে বললো। শুনে সবাই আফসোস করলো , আর তখন থেকে সুবোধ সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলো।জেইলার ও অন্যান্য কর্মকর্তারাও তার আচার ব্যবহারে মুগ্ধ।

একদিন সুবোধ জেইলারকে অনুরোধ করল একটু কাগজ কলম দেওয়ার জন্য। সে জেলে বসে লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ঐদিন সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাগজ কলম আনিয়ে দেওয়া হল। সুবোধ লিখতে আরম্ভ করলো।

ওদিকে লিলিদের চলে যাওয়ার খবর সত্যেনকে আরও অনুতপ্ত করে তুললো। দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় রাতে ওর ঘুম হয় না। বার বার লিলির বাবার সেই মৃত্যুর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বেচারা বাঁচার জন্য কত চেষ্টাই না করেছে।

আর সুবোধ? সেতো তার জন্যই আজ জেলে। অথচ যাকে পাওয়ার জন্য সে দুটো জীবন নষ্ট করল, সেও তাকে ঘৃণা করে। এসব ভাবতে ভাবতে তার নিজের উপর নিজের ঘৃণা হয়। কৃত কর্মের জন্য জীবনটা যেন তার কাছে নরক হয়ে উঠলো। দিনরাত যেন সেই মৃতের আত্মা তাকে তাড়া করছে। রাতে প্রায়ই ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠে। কখনো কখনো পাগলের মত প্রলাপ বকতেও শোনা যায়। বাবা তাকে অনেক ডাক্তার বদ্যিও দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষে এমন হলো যে মানুষ দেখলেই ভয় পায়। ঘর থেকে বের হতে চায় না। সারাদিন ঘরে পাগলের প্রলাপ করে।

ওদিকে সুবোধের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পাঁচ বছর পর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাকে জেল থেকে রেহাই দেওয়া হলো। জেল থেকে মুক্তি পেয়েও সে যেতে চাইছিল না। এ অন্ধকার পৃথিবীতে তার যে কেউ নেই। কোথায় যাবে কেমন করে খাবে। অগত্যা হাঁটতে শুরু করল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে হেঁটে চললো। অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখল পাশে একটা রেলস্টেশন। গ্রামীণ স্টেশন, পাশে গাছের নিচে বসার জায়গা। সে একটা জায়গায় গাছের নিচে গিয়ে বসলো। পাশে আরও দুজন এসে বসলো। ওদের কথাবার্তায় বোঝা গেল ওরা রাতের ট্রেনে অনেক দূরে কোথাও যাবে। সুবোধ অনেকক্ষণ ওখানে বসে চিন্তা করল।ভাবলো ওদের পিছু নেবে। কিন্তু কোথাও যেতে হলে টাকার প্রয়োজন। পকেটে হাত দিয়ে দেখলো,জেলে সঙ্গীদের থেকে পাওয়া শো দেড়েক টাকা আর জেইলার বাবুর দেওয়া একটি পাঁচশ টাকার নোট, ব্যাগে একটা ব্ল্যাঙ্কেট আর তার নিজের লেখা একটি বই, যা জেইলার বাবু তার নিজের খরচে ছাপিয়ে ছিলেন। ব্যাগ থেকে বইটি বের করে এক ঝলক পাতা উল্টিয়ে দেখলো। তার চোখে জল এসে গেল। বোধ করি নিজের অতীত জীবনটা তার মনে পড়ে গেল। পাশের ছেলে দুটো লক্ষ্য করল উস্কো খুস্কো চুল, মুখে এক ঝোপ দাড়ি, চোখে মুখে বিষাদের ছাপ। একজন জিজ্ঞেস করল,' কি হলো দাদা কি ভাবছেন, যাবেন কোথায়?' সুবোধ মাথা নাড়ল তারপর বললো ' জানিনে '। এবার দ্বিতীয় ছেলেটি একটু জোক করে বলল, ' দাদু,একী বলছেন,জানিনে মানে?'

সুবোধ উঠে যেতে চাইল। বোধ করি ঐ দাদু শব্দটা ওর ভালো লাগেনি। সে বুঝতে পারলো তার চেহারা বোধ হয় নিজের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি দেখাচ্ছে। তাই ওরা দাদু বলে সম্বোধন করছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবোধ আপন মনে বিড় বিড় করে বললো, সবই নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস।। কাউকে কিছু বলার নেই। সুবোধকে চলে যাচ্ছে দেখে ওরা আবার একটু এগিয়ে এসে বলল,' কি হলো, কোন সমস্যা থাকলে বলুন, আমরা সাহায্য করবো। ছেলে দুটোর ব্যবহারে সুবোধ একটু থামল। তাদের পিড়াপিড়িতে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল। ছেলে দুটোর বোধ করি একটু দয়া হলো। আবার জিজ্ঞেস করল,' তা দাদা এখন যাবেন কোথায়?'

সুবোধ করুণ স্বরে বলল ' জীবন যেদিকে '।

তারা আরও একটু উৎসুক হল। বলল,' এ কেমন কথা, চলুন তাহলে আমাদের সাথে।' সুবোধ খানিকক্ষণ চিন্তা করল তারপর জিজ্ঞেস করল ' আপনারা কোথায় যাবেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের আবার যদি কোন ঝামেলা হয়?' না না, কোন অসুবিধা হবে না, চলুন।

সুবোধ আরও ভাবনায় পড়ে গেল। এমন সময় ট্রেন আসার শব্দ শোনা গেল। ওরা বললো,' চলুন, ঐ তো ট্রেন এসে গেছে। অগত্যা সুবোধ চললো তাদের পিছু পিছু,। তারা গিয়ে ট্রেনে উঠলো।কিন্তু কোথায় যাবে সে নিজেও জানে না।

এদিকে বেঙ্গালুরুতে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে লিলির জীবনে আসলো এক আমূল পরিবর্তন। অফিসের কাজকর্ম আর মা'কে নিয়ে সম্পূর্ণ রুটিন মাফিক চলাফেরা। অফিসের কাজে এত বেশি চাপ যে কোন কিছু ভাবার সময়ই নেই। সকাল নয়টায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর বিকেল পাঁচটায় ফিরে আসে। এই সময়টুকু মাকে একা ঘরে থাকতে হয়। মা বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। এজন্য প্রায়ই মাকে ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষদের জীবনী ইত্যাদি নানা ধরনের বই কিনে এনে দেয়। অবসর সময় মা এই ভাবে বই পড়ে কাটিয়ে দেন। মায়ের বই পড়ার আগ্রহ দেখে সে নিজেও প্রায়ই রাতে বইগুলো পড়তো। একটি পড়া শেষ হলে আরেকটি কিনে আনতো। এভাবে আরও দু-তিন বৎসর কেটে গেল।

মা অসীমা দেবী বুঝতে পারলেন লিলি পূর্বের সেই ছন্দ আবার ফিরে পেয়েছে। ওর অফিসের সঙ্গী সাথীদের সাথে চলাফেরা আনন্দ উল্লাস সবই যেন ঠিক আগের মতই। মেয়ের খুশিতে মা'ও খুব খুশি।

সেদিন বিকেলে ওর সহকর্মী শান্তা ওর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। শান্তার সঙ্গে মাকে পরিচয় করিয়ে দিল। কতক্ষণ কথা বলার পর লিলি বললো,' তুই মায়ের সাথে কথা বল , আমি ততক্ষণে চা নিয়ে আসি। লিলি চা করতে গেল। অসীমা দেবী অনেকক্ষণ ধরে শান্তার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন। প্রসঙ্গ ক্রমে লিলির জীবনে ঘটে যাওয়া কথাগুলো তার কাছে প্রকাশ করে বললেন, ' এবার তো মনে হচ্ছে ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। কাজেই তুমি ওর বিয়ের ব্যাপারে একটু কথা বলে দেখ। আমার তো বয়স হয়েছে, কখন জানি কি হয়।' শান্তা বলল ' সে আপনি চিন্তা করবেন না , মাসিমা। লিলির জীবনে ঘটে যাওয়া এতো সব কথা তো আমরা কেউই জানি না। এতসবের পরও ও যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে,সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।' লিলি চা নিয়ে এলো।চা পান করে শান্তা বিদায় নিল।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে লিলি লাইব্রেরীতে উঠলো একটি বই কেনার জন্য। দেখতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটা বই এর উপর। লিলি বইটি হাতে নিয়ে দেখল,বইটির নাম ' অবোধ সুবোধ '। কিন্তু একি! সে ভুল দেখছে নাতো? বইটির লেখক সুবোধ চ্যাটার্যী। বইটির পেছন দিক উল্টাতেই লিলির শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। এ যে তারই সুবোধ! বইটি খুলে দেখলো, কিন্তু প্রকাশকের কোন নাম ঠিকানা পেল না। বইটা কিনে সে বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঐদিন রাতে পুরো বইটা সে পড়লো। অতীত জীবনটা আবার তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। এ যে সম্পূর্ণ সুবোধের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা। তাহলে সুবোধই লিখেছে। সুবোধ তাহলে লেখক হয়ে গিয়েছে? কিন্তু ও এখন কোথায় আছে কেমন আছে! বইটি তন্ন তন্ন করে পড়েছে কিন্তু সুবোধের কোন ঠিকানা বা ওর বর্তমান অবস্থা কিছুই খুঁজে পেল না। সুবোধ কি তাহলে ছাড়া পেয়েছে, নাকি---- । সারা রাত তার আর ঘুম হয়নি।

পরদিন আবার ঐ লাইব্রেরীতে গিয়ে বইটির প্রকাশকের কোন ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ নিল। কিন্তু প্রকাশকের কোন হদিস ই সে পেল না।

আবার লিলির অতীত জীবনটা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। সেদিন অফিসের টিফিন আওয়ারে লিলি শান্তাকে বলল,' তোর সাথে কিছু জরুরি কথা আছে,চল চা খেতে খেতে একটু আলাপ করবো।' দুজন গিয়ে কেন্টিনের এক পাশে চা- রুটির অর্ডার দিয়ে বসলো। এরপর লিলি শান্তাকে বলল ' তুই আমাকে একটু হেল্প করতে হবে, আগে কথা দে তুই কাউকে কিছু বলবি না।' শান্তাকে শর্তবন্দি করে লিলি ওর হাত ধরে তার অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। সব শোনার পর শান্তা বলল,'এখন তাহলে কি করবি? যা হবার তা তো হয়ে গেছে। অতীতটাকে তুই এবার ভুলে যা। নতুন করে আবার জীবন শুরু কর। যে লোকটার পনেরো বছর জেল হয়ে গেছে তার কথাতো আর চিন্তা করে লাভ নেই। ' কথা কটি শেষ হতে না হতেই দেখে লিলির দুচোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। চোখের জল মুছতে মুছতে সে ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে দেখালো। বলল 'এই সেই সুবোধ।' বইটি পড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। সে আমাকে ভুল বুঝেছে। আমি ওর সাথে একবার দেখা করতে চাই। আর এ ব্যাপারে একমাত্র তুইই আমাকে সাহায্য করতে পারিস'। এখান থেকে মাত্র এক রাত্রির জার্নি। আমি কাল ওর সাথে দেখা করতে যাবো আর পরদিন ঘুরে আসবো। এই সময়টুকু তোকে ম্যানেজ করতে হবে। আমি মাকে বলবো অফিস শেষে আমি তোদের বাড়িতে যাবো আর রাতে তোদের ওখানে থাকবো। তুইও মাকে ফোন করে বলে দিবি আমি তোদের ওখানে আছি। যেমন করেই হোক আমি জেলে ওর সাথে দেখা করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবো।'

শান্তা লিলিকে অনেক করে বুঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু সে কিছুতেই মানতে রাজি হলো না। আবার সে শান্তার হাত দুটো ধরে বলল,' আমার দিব্যি,তুই সব ম্যানেজ করিস।'

যথারীতি পরদিন অফিসের কাজ শেষ করে লিলি রাতের ট্রেন ধরতে ব্যাঙ্গালোর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছল। সময় তখন সন্ধ্যা ছয়টা। ট্রেন আসতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। লিলি প্লাটফর্মের একপাশে দাঁড়িয়ে আনমনে মোবাইল দেখে দেখে চিন্তা করছে। এই প্রথম সে মাকে মিথ্যা কথা বলে এতদূর যাচ্ছে।

একটা অজানা আতঙ্ক একটা দুশ্চিন্তা।

ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেছে। লিলি খুব দ্রুত ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্লাটফর্মে একটা লোকের সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে তাকালো। এরপর সরি বলে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠলো। কিন্তু সে বারবার ঐ লোকটার দিকে ফিরে তাকাল। লোকটাও তার দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে। লিলি ট্রেনে উঠা অব্দি তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকটা চেনা চেনাই মনে হলো। ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু লিলি ঐ লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে , প্লাটফর্মে ধাক্কা লাগার পর থেকে তার মনটা কেমন যেন করছে। লোকটাকে দেখতে অনেকটা সুবোধের মতোই মনে হলো। কিন্তু ----একটু বয়স্ক --তাছাড়া --- সুবোধ তো এখানে আসার কথা নয়। 'ধ্যোৎ আমি এসব কি ভাবছি!' লিলি নিজের চোখ রগড়ালো। ট্রেন এগিয়ে চললো আর লিলির ভাবনাও ট্রেনের শব্দের সাথে একাকার হয়ে গেল।

সুবোধের কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি। সে লিলিকে যথার্থই চিনতে পেরেছে। কিন্তু--- এই অসময়ে লিলি এখানে --- আর ও যাচ্ছেই বা কোথায়? এটা কি তার মনের ভুল না অন্য কিছু? সঙ্গে থাকা ছেলে দুটো সুবোধকে ডাকলো, চলুন দাদা, কি হলো? সুবোধ সম্বিৎ ফিরে পেলো। অগত্যা তাদের পিছু চললো।

পরদিন সকাল দশটায় লিলি পৌঁছল সেই জেল প্রাঙ্গনে। সে অনুমতি নিয়ে জেইলারের পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ' সুবোধ - মানে সুবোধ চ্যাটার্যী বলে একজন কয়েদির সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।' জেইলার বললেন ' সুবোধ বলে একজনের তো কালই রিলিজ হয়ে গেছে।' কথাটা কনফার্ম হওয়ার জন্য সে ব্যাগ থেকে বইটি বের করে দেখালো। জেইলার বললেন, হাঁ, এ ই সেই সুবোধ। ও জেলে বসে বসে এই বইটি লিখেছে, আর আমিই ওটা ছাপিয়েছি।

লিলি জিজ্ঞেস করল,' উনি এখন কোথায়,আপনি কি কিছু বলতে পারেন?' জেইলার মৃদু হেসে বললেন,' তাতো বলতে পারিনে। বেচারা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে চায়নি।ওর নাকি যাওয়ার মত কোন জায়গা নেই।তবু কাল তো সে চলে গেছে। কোথায় হতে পারে তা তো বলতে পারিনে, তবে এইটুকু বলতে পারি, মানুষটা কোন দোষী নয় তবুও জেল খেটেছে। আর ওর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ঠিক সময়ের আগেই গতকাল তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

লিলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে ফিরে চললো। তার মনে নানা কথার উদয় হতে লাগলো। তাহলে কি ঐ প্লাটফর্মে ধাক্কা খাওয়া লোকটাই তার সুবোধ? কিন্তু সে ওখানে যাবে কেন? ভাবনার অন্ত নেই। সে আবার বিকেলের ট্রেনে বেঙ্গালুরু রওয়ানা হল। ট্রেন যতই এগিয়ে যেতে লাগলো তার ভাবনাও ততই বাড়তে লাগলো।

এদিকে সুবোধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ ছেলে দুটোর সাথে হেঁটে হেঁটে তাদের রুম পর্যন্ত চলে গেল। ছোট একটা রুম। তারা দুজন ভাড়া করে থাকে আর একটা কোম্পানিতে কাজ করে। সকাল আটটায় বেরিয়ে যায় আর রাত্রি আটটায় ফিরে আসে। সেদিন রাতভর সুবোধের সাথে তাদের কথোপকথন চললো। সুবোধ তাদের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, একজনের নাম মানিক আর একজন রতন। তারা সুবোধের জীবন বৃত্তান্ত জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে সে তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুটা খুলে বলল। তাদেরকে হাতের বইটি দেখাল এবং সে সময় পেলে আরও কিছু লিখার ইচ্ছে প্রকাশ করল। সুবোধের মুখে তার করুণ জীবন বৃত্তান্ত শুনে এবং তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তারা বললো, ' দাদা আপনি আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। আপনি ক'দিন আমাদের এখানে থেকে যান। আমরা তো সকাল হলেই ডিউটিতে চলে যাব আর রাতে ফিরে আসবো। ততক্ষণে আপনি লেখালেখি করবেন আর যদি ইচ্ছা হয় পাশেই একটা পার্ক আছে আর ওদিকে একটা বাজার আছে। আপনার ইচ্ছা হলে ঘুরে আসতে পারবেন।' সকাল হলে ওরা খাবার প্রস্তুত করল। তিনজন মিলে খেয়ে সুবোধকে একা ঘরে রেখে তারা ডিউটিতে চলে গেল। সুবোধ সারাদিন একা একা ঘরের মধ্যে কখনো কিছু লিখে আবার কখনো মনের শোকে গান গায়। এভাবেই দিন যেতে লাগল। শেষে এমন হল যে দিনের বেলায় সে যে গান লিখে রাতে সেগুলো তাদের গেয়ে শোনায়। আর তারা দুজনও সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতে ওর গান শুনে খুব আনন্দ পায়। কিছুদিনের মধ্যেই আসপাশের লোকজন জেনে গেল তার গানের প্রতিভা। মাঝে মধ্যে কোন অনুষ্ঠানে তাকে গান গাইতেও দেখা গেল।

ওদিকে লিলি পরদিন ভোর পাঁচটায় বেঙ্গালুরুতে এসে পৌঁছায়। সে প্রথমে স্থির করেছিল শান্তার ওখানে যাবে তারপর অফিস শেষ করে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে তার মনটা আরও ভারি হয়ে উঠলো। এইতো এই প্লাটফর্মেই হয়তো সুবোধকে পাশে পেয়েও সে হারালো। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করলো তারপর সোজা অফিসে চলে গেলো। তখনো কেউই অফিসে আসেনি। সে বারান্দায় বসে শান্তাকে ফোন করল একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য। শান্তা এলে তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। সবকিছু শুনে শান্তা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। সেদিন অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। তার মনটা আজ খুব ভারি। ঘরে পৌঁছতে মা জিজ্ঞেস করলেন,' কিরে তোর কি হয়েছে? সে বলল,' না মা কিছু হয়নি, এমনিতেই ভালো লাগছে না।' লিলি অনেক বার ভেবেছে মা'কে সব কথা খুলে বলবে, কিন্তু কথাটা কেমন করে বলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। মা কিন্তু আঁচ করতে পেরেছেন যে কিছু একটা হয়েছে।

রাতে খেতে বসে মা বললেন,' হ্যাঁ রে কাল ওপাড়ার বাড়ুজ্যে বাবু এসেছিলেন, তোর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। তোদেরই অফিসের, কি জানি নামটি, খোকন নাকি, উনার কথা বললেন। লিলি নাক সিঁটকে বলল," তারপর?'

অসীমা দেবী মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন ' দেখ মা,তুই আমার একমাত্র মেয়ে, তোকে পাত্রস্থ না করলে

আমার যে নরকেও স্থান হবে না। কেন তুই জেদ ধরে বসে আছিস?' 'যে লোকটার পনেরো বছরের জেল হয়েছে ওর কথা ভেবে নিজের জীবনটাকে তুই শেষ করে দিবি ' এবার লিলি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলনা। বললো,' মা আমি সুবোধকে ভালোবাসি আর আমি ওকে কথা দিয়েছি 'মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন,' রাখ তোর ভালবাসা। এ যুগে ভালবাসা টালোবাসা কিছু নেই, তুই ওকে ভুলে যা।' লিলি জবাব দেয়,' না মা ভালবেসে ভোলা যায় না। এটা হচ্ছে আমার প্রথম ভালোবাসা, আর প্রথম ভালোবাসা জীবনেও ভোলা যায় না।'

'বুঝলাম,' মা বললেন ' কিন্তু ও তো জেলে আছে।'

লিলি বলল,' তাহলে কি হলো,ও তো বিনা দোষে ----

বিনা দোষে ওর জেল হয়েছে, আর আমার কারণেই হয়েছে। বাবার যেদিন স্ট্রোক হয় সে ই প্রথম এগিয়ে এসেছে।ঐ সময় সে ই ছিল আমাদের একমাত্র সাহারা। আর তুমি তো জানোই ,ও বাবাকে খুন করেনি। করেছে ঐ সত্যেন আর বেচারা বিনা দোষে -- বলতে বলতে লিলি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।

লিলি আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলতে লাগলো,' জানো মা, কাল আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তোমাকে না বলে আমি জেলে সুবোধের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

মা অবাক হয়ে বললেন,' তারপর?'

' সুবোধ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ও কোথায় গিয়েছে তা তো কেউ বলতে পারে না। তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার মন বলছে আমি ওকে পাবো। তার জন্য হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

সেদিন জে,এস,সি, প্রাইভেট কোম্পানির অফিসে একটা ছেলে ইনভাইটেশন লেটার নিয়ে আসলো। সে ম্যানেজারের হাতে লেটারটা দিয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় তার চোখ পড়ল শান্তার দিকে। তার মালিকের বাসার পাশেই ওর বাসা। শান্তা তাকে খুব ভালো চেনে। শান্তা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, , 'কি হে মানিক, তুমি এখানে?'

'না,মানে একটা ইনভাইটেশন লেটার দিতে এসেছিলাম। আপনারা সবাই আসবেন। আগামী চৌদ্দ নভেম্বর বুধবার আমাদের বিট্টু মানে আমাদের রমন বাবুর নাতির জন্ম তিথি তাই।'

শান্তা বলল ' ও, তাই বুঝি।! আচ্ছা ঠিক আছে।'

মানিক চলে যাচ্ছিল হঠাৎ তার চোখ পড়ল শান্তার হাতের বইয়ের দিকে।

''দিদি এ বইটি আপনি কোথায় পেলেন?' মানিক জিজ্ঞেস করল।

শান্তা উল্টে প্রশ্ন করল, 'কেন, কি হয়েছে?'

'না, এমনিতেই। বইটার গল্প শুনেছি। বড়ই করুন কাহিনী, বেচারা সুবোধ।'

শান্তা বলল,' হাঁ, খুব ভালো বই।

' তা হবে না কেন? এ যে আমাদের দাদা সুবোধ চ্যাটার্যীর লেখা।' মানিক গর্ব বোধ করলো ।

শান্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিভাবে জানো, তুমি কি তাকে চেনো?'

'চিনি কি মানে? ও আমার দাদা, শুধু লেখক নয় একজন ভালো গায়কও। আসবেন দিদি আমাদের অনুষ্ঠানে, দেখবেন উনি কেমন গান করেন। সুবোধ ইতিমধ্যে অনেক গুলো গান লিখেছে এবং রীতিমত গায়ক হয়ে উঠেছে। আশপাশের বিভিন্ন অরকেস্ট্রা পার্টিতে গান গেয়ে অনেক প্রশংসাও অর্জন করেছে ইতিমধ্যে।

সেদিন মানিক আর রতন এসে সুবোধকে বলল তাদের মালিকের ফ্ল্যাটে একটা অনুষ্ঠান আছে। তাকে ওখানে নিমণত্রণ করা হয়েছে। চৌদ্দ নভেম্বর মালিকের নাতির জন্মদিন। জন্মদিন হলে কি হলো বড়লোক বলে কথা, বিশাল আয়োজন। এক সপ্তাহ আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু। এ অঞ্চলের কাউকে নিমণত্রণ দিতে বাকি রাখবেন না।

সুবোধ শুনেই চমকে উঠল, বলল ' না বাবা আমি যাবো না '

কিন্তু মানিক ও রতনের পীড়াপীড়িতে শেষে রাজী হলো।

চৌদ্দ নভেম্বর বিকেল ছ'টায় অনুষ্ঠান।

সেদিন মানিক আর রতন একটু সকাল সকাল প্রস্তুত হয়ে সুবোধকে সাড়ে পাঁচটায় সেখানে পৌঁছার কথা বলে লোকেশনটা একটু ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিল। তারা বললো ফ্ল্যাটের পাশে গিয়ে যেন ফোন করে। তারা একজন এসে তাকে নিয়ে যাবে।

যথা সময়ে সুবোধ সেখানে পৌঁছে মানিককে ফোন করল। ইতিমধ্যে মহল লোকে লোকারণ্য। মানিক ওদিকে ব্যস্ত থাকায় একটি ছেলেকে পাঠিয়ে সুবোধকে উপরে নিয়ে গেল। উপরে উঠে তো সুবোধের চক্ষু চড়কগাছ। এমন আলোকসজ্জা আর এমন রাজমহল সে জীবনে কল্পনাও করতে পারেনি। মানিক এগিয়ে আসতেই সে বলল,' আমাকে আপনারা এ কোথায় নিয়ে এলেন, আমার ভয় করছে।'

'দাদা দেখতে থাকুন। গতকাল থেকে বাড়ীতে ভিয়েন বসিয়ে রান্নার কাজ চলছে। হাজার মানুষের ভিড়ে আপনি আজ স্পেশাল।' বলে তাকে একপাশে বসিয়ে রেখে সে চলে গেল। সুবোধ লক্ষ্য করল আরও অনেক অতিথি আসছেন। এতো জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ আর এত অপরিচিত লোকের ভীড়ে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। যারাই আসছে একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় করছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পোশাকধারী কয়েকটি ছেলে ঠাণ্ডা পানীয় আর নানা ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য পরিবেশন করছে। অতিথিরা যার যা খুশি নিচ্ছে আর খাচ্ছে। একটু পরেই দেখা গেল প্যান্ট কোট টাই পরিহিত মাঝবয়সী ভদ্রলোক সঙ্গে এক মহিলা, বেশভূষায় মনে হচ্ছে রাজরাণী আর পেছনে দুজন গার্ড। সুবোধ লক্ষ্য করল গার্ড দুজনের পরনে সাদা প্যান্ট, নীল রঙের শার্ট, মাথায় পাগড়ি পরা আর পাগড়ির উপর এক গুচ্ছ ময়ূরের পুচ্ছ উপর থেকে নেমে আসছেন। সুবোধের বুঝতে বাকি রইলো না যে ইনিই এই ফ্ল্যাটের মালিক। উনারা পাশে আসতেই একজন বলে উঠল,' উপস্থিত বন্ধুগণ, ইনি হচ্ছেন আমাদের জুট ইণ্ডাস্ট্রির মালিক শ্রী যুক্ত

ভি, এস, রমন আর সঙ্গে উনার সহধর্মিণী অনুরাধা রমন।' সবাই একসাথে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানালো। তিনি আসন গ্রহণ করলেন। উনারা আসন গ্রহণ করলে গার্ড দু'জন সুবোধকে পাশে নিয়ে যেতে আসলো। ওরা পাশে আসতেই সুবোধ চমকে উঠল। ওরা যে মানিক আর রতন সে একটুও চিনতে পারেনি। ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে মনিবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। মানিক বলল,' ইনিই সেই সুবোধ চ্যাটার্যী, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম।'

সুবোধ তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন,' আসুন,বসুন। আপনার অনেক তারিফ শুনেছি। আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হলাম।

টেবিলে আগে থেকেই বার্থ ডে কেক সাজানো ছিল। পাশে বিট্টু আর তার মা বাবা দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে। রমন বাবু এগিয়ে আসলেন। বার্থ ডে কেক কাটা হলো। সমস্ত হল জুড়ে সাউন্ড সিস্টেম বেজে উঠলো, হেপ্পি বার্থ ডে টু বিট্টু।সেই সাউন্ডের সাথে সমস্ত হলের সবাই সুর মেলালেন।

এরই মধ্যে সকলকে বার্থ ডে কেক পরিবেশন করা হলো।

এবার রমনবাবু ঘোষণা করলেন, 'বন্ধুগণ, আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত স্বনামধন্য গায়ক সুবোধ চ্যাটার্যী। আমি তাকে অনুরোধ করছি, আজকের এই বিশেষ দিনে উনার কণ্ঠে আমরা একটি গান শুনবো। সুবোধ আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রমন বাবু সে সুযোগ না দিয়েই সরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চিৎকার করে হাততালি দিয়ে যে যেখানে পারল বসে পড়ল।

সুবোধ বাধ্য হয়ে গান ধরলো --

আজিকার এ জলসা ঘরে
কি গান গাইবো আমি,
কী পাপে জনম নিলাম,
জানে শুধু অন্তর্যামী।।
আজিকার ...

গানের কড়িগুলো রিপিট করতেই তার চোখ পড়ল লিলির উপর, সে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে আর ওর পাশে মা' বসে আছেন। ওকে দেখা মাত্রই হঠাৎ সে পড়ে গেল।

কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। সবাই নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানিক দৌড়ে এসে ওকে ধরে তুলল আর কানে কানে কি যেন ফিসফিস করলো। সুবোধ উঠে দাঁড়ালো। দু'চোখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই গানের সুর পরিবর্তন করে আবার আরম্ভ করলো, লিলির গাওয়া সেই গানটি-

আমার এ আঁধার জীবনে
আলো হয়ে দিলে জোসনা-
তুমি শুধু ভুল বুঝোনা-

সে কী করুণ কণ্ঠ, যেন এক করুন আর্তনাদ। গান শেষ হতে না হতেই অসীমা দেবী বললেন,' এতো সুবোধই মনে হচ্ছে।' লিলি ইতিমধ্যে ভিড় অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর দু'চোখ থেকে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। দুহাতে চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে পেছনে মা ও শান্তা। পুরো হল নিস্তব্ধ। মানিক রমনবাবুর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কি জানি কি বললো।

রমনবাবু উঠে একহাতে সুবোধকে ধরলেন আর একহাতে লিলিকে পাশে ডাকলেন। সবার মধ্য ভাগে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন,' বন্ধুগণ, আজকের এ জন্মদিন অনুষ্ঠানের সাথে আরও একটি অনুষ্ঠান সংযোজন হল। আজ এখানেই এ দুজনের বিয়ের পর্ব সম্পন্ন হবে। শান্তা এগিয়ে এসে বলল,' এই যে, লিলির মা অসীমা দেবী এসে গেছেন।'

রতন বললো,' ঐ তো পুরুত কাকু পাশেই রয়েছেন।' সঙ্গে সঙ্গে পুরুত মশাই বলে উঠলেন,' উলু ধ্বনি দিন,শঙ্খ বাজান।

মানিক সুবোধের কানে কানে ফিসফিস করে বলল,'দাদা---

<><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

তপন প্রজাপতি
খন্ড প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক,
লালা শিক্ষা খন্ড

অন্বেষণ

সুস্মিতা মজুমদার

অন্বেষার চোখে আজ ঘুম নেই। মন, মস্তিষ্ক যখন শান্তিতে শান্ত থাকে, তখনই নিশ্চিন্তে ঘুম আসে। কিন্তু ওর মন যে আজ বিক্ষিপ্ত, মস্তিস্কে অশান্ত ঝড়ের দাপাদাপি। বয়স তো কম হলো না। তাকে দেখতে খুবই সুন্দরী। বয়সও বুঝা দায়। অন্যরা যাই বলুক সে নিজে তো জানে।

অন্বেষার ভাবতে ভালো লাগে সবাই যখন ওকে দেখে ভাবে, ও কত আনন্দে আছে, সুখে আছে, কোন ঝুট ঝামেলা, কোন দায়িত্ব বন্ধন না থাকা সত্যিই খুব আনন্দের ?

কে বলে কোন বন্ধু নেই, সবই তো ছিল। জীবনে সব জিনিসই হাতে এসেছিল কিন্তু তার পক্ষে কিছুই ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বালির মত ঝুরঝুর করে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সব ঝরে পড়েছে। অবশ্য সেও ধরে রাখতে কোন চেষ্টা করেনি। কেনই বা করবে ? জোর করে কিছু ধরে রাখা যায় না, কথাটা সে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে।

কে বলে তার কিছু ছিল না। সব ছিল। পৃথিবীর মানুষের যা যা থাকার সব ছিল। একটা সুন্দর সংসারের বাবা মায়ের একমাত্র কন্যা সন্তান ছিল। ভালবাসায় আদরে যত্নে রেখেছিলেন তারা। তাইতো একটু জেদী একগুয়ে হয়ে উঠেছিল। একমাত্র সন্তানের সাত খুন মাফ ছিল।

এদিকে সময়ের আগে প্রেমে পড়ল। তার পরিণতিতে বিয়েও করে বসলো। বাবা মা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। না করে কোন উপায় ছিল না। ওর জেদের কাছে চিরকালই তারা মাথা নত করেছেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর যোগ্য সম্মান পেল না। মেয়েকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন নি। ঘর রান্নার কিছুই শেখান নি, মেয়ে চিরকাল শুধু নেচে গেয়েই বেড়িয়েছে এসব বলে চরম অপমানিত করেছেন। এমনকি তাদের মেয়ের শ্বশুড়বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত ছিল না। বাবা মা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তাদের মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে ভাল থাকবে না। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ওর নিজের ভাগ্য সে নিজেই লিখেছে।

বাবার আনন্দ ছিল তিনি মেয়েকে বেশি আসকারা দিতেন। কাজেই মেয়ের দুঃখ তার বুকেই বেশি বেজেছিল। নিজের সন্তানকে আলবাসা কি অপরাধ ? এই আঘাত সহ্য করতে পারলেন না, অচিরেই শয্যা নিয়েছিলেন আর অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছিলেন। মা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন অথচ মেয়ে হয়ে তার কিছুই করার ছিল না।

তার স্বামী ঋষি, তার গুনমুগ্ধ, সারা জীবনের জন্য তার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আপন করে নিয়েছিল। অন্বেষার সেই গুণগুলি শ্বশুরবাড়ির বিশেষ করে শাশুড়ীর কাছে ছিল প্রচণ্ড দোষের। তারা অন্বেষার কোন গুনই দেখতে পেতেন না। সে নাকি অন্যদের সন্তোষ্ট করে প্রোগ্রামগুলো জোগাড় করে। বুক ভেঙ্গে যায় অন্বেষার কত সাধনায়। কত অনুবীলনে নিজেকে তৈরি করেছে। আর শাশুড়ী বলেন কি না - ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ভাবতেও মনটা তিক্ততায় ভরে ওঠে। উঠতে বসতে প্রতি পদক্ষেপে সব ব্যাপারে খোটা শুনতে শুনতে অন্বেষা অধৈর্য হয়ে উঠছিল।

ঋষিও বুঝতে পারছিলো, এভাবে আর চলতে পারে না। এবার কিছু ভাবতে হবে। নিজের মত করে একটা বাড়ি খুঁজতে থাকে। অবশেষে একটা বাড়ি খুঁজে পেল। অন্বেষার সাথে নতুন করে সংসার শুরু হলো। আনন্দ আর আনন্দ। বিনা দ্বিধায় প্রোগ্রামে গুলো করতে লাগলো। অন্বেষার প্রচুর নাম ডাক হলো। ঋষির ব্যবসাও খুব ভালো চলতে থাকে। দেখতে দেখতে বৎসর দুয়েক পেরিয়ে গেল। তারপর ওদের এক ছোট্ট পরী এলো। আনন্দের সাগরে ভাসলো ঋষি আর অন্বেষা। কিন্তু তাদের মেয়ে হওয়া নিয়ে আবার মায়ের আপত্তির ঝড় তুললেন। যেন মেয়ের জন্ম দিয়ে অন্বেষা খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছে। এমনিতেই তারা আলাদা থাকছে বলে অন্বেষা তার চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে তার ওপর মেয়ের জন্ম দিয়ে আরও শাশুড়ী মায়ের বিরাগ ভাজন হলো।

এখন আর কারো বিরাগ ভাজন হওয়ার তোয়াক্কা করে না অন্বেষা। চোখের সামনে তো নেই সে। ওনার আচরণের সোজাসোজি কোন প্রভাব তো পড়বে না। অন্বেষা সব ভুলে নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেয়ে মানুষ করা থেকে শুরু করে নিজের কাজের জায়গায় তার একাগ্রতা ব্যতিত শীর্ষে নিয়ে যায় তাকে। ধীরে ধীরে মেয়ে বড় হতে থাকে। স্কুলে যাওয়া আসা করতে শুরু করে। দিন পেরিয়ে যায় তার নিজের নিয়মে। তারমধ্যে অলক্ষে ঋষির সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। ঋষির ব্যবসার কোন খবর সে বিশেষ জানতো না, জানার প্রয়োজন বোধ করে নি। নিজের জগৎ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে বাকি সব থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে খেয়াল রাখতে পারেনি। মেয়েটা যে কখন বাবার আপন হয়ে তাকে পর করে দিয়েছে সে কথা বুঝতেই পারেনি। কেন যে সে আপনজনদের নিজের করে ধরে রাখতে পারে না। যখন সে খ্যাতির চূড়ায় তখনই বাবা মেয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। হতবাক অন্বেষা সেই ধাক্কা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার ভুল যে কোথায় সেই কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির

হয়ে পড়ে। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী সীমা তখন তাকে দুহাতে আগলে ছিল। খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে একা হয়ে গেল। বাইরের জগতে তার জয় জয়কার। অথচ অন্দর শূন্য। কাছের মানুষ অর্থাৎ বন্ধু বান্ধবেরা বুঝতে পারতো। সমব্যথী হয়ে সান্ত্বনা দিত। প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষকে অত্যন্ত আপন করে পেয়েছে। যাদের আদর যত্নে ভালোবাসায় সে গলে যেত। ভালোবাসার কাঙাল ছিল অন্বেষা। ভালোবাসা পেলে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তার অতীত নিয়ে কৌতুহল দেখলেই সে সতর্ক হয়ে পড়ে। সেখানে কাউকে বুঝতে দিতে রাজী নয়।

দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধার ছুটে আসে। নির্জন ঘরে সব খ্যাতি যশ ম্লান হয়ে আসে। একাকীত্ব এসে বুকে চেপে বসে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আপন হতে তো অনেকেই আসে। কিন্তু মনের কাছাকাছি কাউকে আসতে দেয়নি অন্বেষা।

অবশেষে এলো সেই স্বপ্নদ্রষ্টা। সে তার গুণের প্রকৃত বোদ্ধা। তাকে দেশ থেকে শান্তরী করতে চাইলো। হাফিয়ে ওটা প্রাণে যেন মলয় বাতাস লাগে। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পাখা দুটো মেলে উড়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়।

আবার আনন্দের সাগরে ভাসে অন্বেষা। তার মনের মানুষ। তাকে সসম্মানে ঘরে আর মনেও স্থান দিয়েছে। দিনগুলো স্বপ্নের মত পেরিয়ে যেতে থাকে। নানা অনুষ্ঠান, ফাংশন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য। চারিদিকে নাম যশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হায় রে অন্বেষার ভাগ্য। কোন কিছুই স্থায়ী হয় না তার জীবনে। বৎসরখানেক পেরনোর আগেই অন্বেষার মনে অস্বস্তির মেঘ জমতে থাকে। কোথাও যেন তাল কেটে যাচ্ছে। সুর বেসুরো বাজছে।

জীবন তাকে অনেক শিখিয়েছে। তার অবচেতন মনে যেন বিশদ সংকেত বাজতে থাকে। তার ভাগ্যও এমনি যে যতসব গোপন কথা তার কানেই এসে পড়ে।

যার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ হয়েছিল, যার হাত ধরে সে দেশ ছেড়েছিল নির্দ্ধিধায়। সে ছিল এক ডুবন্ত জাহাজ। তাকে ভর করে সে ভেসে উঠতে চাইছিলো। মনটা তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। কালক্ষেপ না করে সব ছেড়ে ছুড়ে দেশে ফিরে এসেছিল।

পরিচিত পরিজনের মাঝে এসে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে। আপনজন বলে তার পাশে কেউ নেই কিন্তু পরিজনের অভাব নেই। সকলেই তার শুভাকাঙ্খি। তাদের সান্নিধ্যেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করলো।

আবার তার চিরদিনের সঙ্গী সীমাকে খুজে নিল। সীমার তার সময়ের সুখ দুখের সঙ্গী। কখন কোথায় কি লাগে সব জানে। কিছুই বলে দিতে হয় না। ওর হাতেই নিজের জীবন সঁপে দিয়ে সুস্থির হলো অন্বেষা। আবার ডানা মেলে দিল অজানিয়া।।

<><><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

সি এইচ বাবাতন সিংহ
সভাপতি, হাইলাকান্দি জেলা সেপাকটাকরো এসোসিয়েশন ও কোষাধ্যক্ষ,
আসাম রাজ্য সেপাকটাকরো এসোসিয়েশন।

অন্তর্দাহ

রফিক উদ্দিন লস্কর

শহরের ঠিক মাঝখানে সুরম্য তিনতলা বাড়িটি, নীচের তলার পূর্বদিকে একটা সুন্দর ফুলবাগান। জুই, মালতী, গাঁদা, গোলাপ আর সূর্যমুখী বাড়ির সৌন্দর্য যেনো অনেকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। দুপুর বারোটা, রোদটা যেনো ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে অন্দরমহলে হানা দিচ্ছে। এমন সময় মোবাইলে একটা লম্বা রিং, সুহানা হেঁসেলের কাজ মাঝপথে ফেলে কলটা রিসিভ করলো। হ্যালো, কে?... আমি রাজেন। কোন রাজেন? আমি তো পুরো ধরতে পারছি না! হুম, সেই চেনা গলা, সুর একসময় অচেনা অজানা লাগে বলে রাজেন চট্ করে ফোনটা কেটে দিলো।

সুহানা একটু ইতস্তত করে আবার কাজে মনোনিবেশ করে। সকালের পড়ে থাকা সেই বাসনপত্তর একমনে বসে ঘষতেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলে আসা হাজার পুরোনো স্মৃতি বারবার তার মনের বারান্দায় পায়চারি করেছে। ঘরসংসার করে আজ আধবুড়ি। সুহানা সেই আগের মতো আর মিছেমিছি কোন বিষয় নিয়ে তেমন ভাবে না। নিজের ছেলেপুলে এখন মানুষ করা এটাই সবসময় মাথায় ঘুরপাক খায়। একসময় সুহানা এমন ছিলো, বন্ধু বান্ধবীদের কোন একটা সমস্যা হলে সে নিজেই সেই সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতো এবং তার একটা নিতান্ত সুরাহা বের করে দেওয়া একটি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে ছিলো। স্কুল কলেজে পড়ার সময় সহপাঠীর একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু সুহানা। স্নাতক শেষ করা মাত্রই বিয়ের পিঁড়িতে। মহা ধুমধাম, ডাক্তার বর। সে অনেক আগের কথা, তবুও যেনো চোখের সামনে লাইভ ভিডিওর মতো ভাসছে।

এমন সময় রাসেল মা মা বলে ঘরে ঢুকলো, শনিবার তাই স্কুল থেকে একটু আগে বাসায় ফিরছে। খা খা রোদে নরম শুভ্র ত্বক লাল কালচে। শরীরের শ্বেতাভ বসন ভিজে একাকার দেহের ঘর্মে। মা আজ অন্যরূপী, মা ডাকটা যেনো আজ আর কানে বিশেষভাবে প্রতিধ্বনি দেয়নি। রাসেল হঠাৎ গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে সজোরে একটা টান দিলো, সুহানা পাথর থেকে জলের মতো হয়ে রাসেলের দিকে তাকিয়ে বললো, আজ এত্তো সকাল সকাল ফিরলি টিউশনে যাস্ নি? মা... আজ শনিবার তোমার মনে নেই? অহও! আয় ড্রেস বদলিয়ে দেই। বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেস হয়ে আয়, আমি রান্নার কাজটা শেষ করি।

রাসেল ফ্রেস হয়ে বৈঠকখানায় এসে টিভির রিমোট হাতে নিয়ে টিভিটা অন করলো, তার ফেভারিট চ্যানেল পগোতে যেনো নিজেকে বিলীন করে দিলো। সামনের টেবিলে রাখা মায়ের মোবাইল, হঠাৎ একটা মিসকল! ট্রু কলারে ভেসে উঠছে একটা নাম লাবনী। সে মোবাইলটা হাতে নিয়ে মায়ের কাছে দৌড়ে গেলো।, মা মা একটা মিসকল এসেছে, নাম দেখাচ্ছে লাবনী। সুহানা সেই নাম্বারে কলব্যাক করলো, অপর প্রান্ত থেকে প্রত্যুত্তর... আমি মামনির মিস্ বলছি। মামনির কলেজ কয়েকদিনের জন্য ছুটি লকডাউনের কারণে। এত্তো দূর যাওয়া সম্ভব নয়, ট্রেন চলাচল একদম বন্ধ, তবে চিন্তা করোনা ও আমার এখানে থাকবে এ ক'দিন। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে ফোন বিচ্ছিন্ন হলো। কারণ জিও নেটওয়ার্ক!.

সুহানা ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়লো, কি করা যায়! এ ক'দিন থেকে ডাক্তারবাবু রাজীবও ঘরে ফিরছেন না। একমাত্র সম্বল রাসেলকে নিয়ে এই বিশাল অট্টালিকায় দিন কাটছে। এদিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের যা অবস্থা তাতে কোন সময় কি হয় বলা মুশকিল। শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিশ, মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে ঝড়ের ন্যায় ছুটছে এম্বুলেন্স। টিভিতে সাংবাদিকের উচ্চস্বর, ব্রেকিং নিউজ! নির্জনতা যেনো ছায়া ফেলেছে ব্যস্ততম শহরে, শপিং মল, রেস্তরাঁয় শাটার ফেলানো। বাইকারসদের দৌরাত্ম্য, চায়ের দোকানে বসে কতো আড্ডা, রাজনীতির গল্প এসব এখন অমাবস্যার চাঁদের মতো। সকাল হলে ফেরিওয়ালার চর্বণীয় আওয়াজ শোনা যায় না। জীবন বাজি রেখে মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে দু'এক সব্জিওয়ালা, তাও পুরোনো বাসি সব্জি। রাসেল ক্লাস সিক্সে পড়ে, স্কুল বন্ধ থাকায় সে এখন মায়ের সহচর। না হলে তো সকাল আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত ও নিজের স্কুল আর টিউশন নিয়ে ব্যস্ত। রাজীববাবু সেই আগের মতো আর ফোন করেন না, করলেও দেড় দু'মিনিট সময় গত হয়। হাসপাতাল গুলোতে যেনো নবান্নের উৎসব। কড়া নজরদারি, তাছাড়া যেসব রোগীরা আসেন ওদের পরিচর্যাকারী আপন কেহ আসে না। ওরা স্বেচ্ছায় নির্বাসিত আপনজন আর মাতৃভুমির জন্য।

সুহানা কুঁকড়ে গেছে ভয় আর আতংকে। চোখে নিয়মিত সর্ষে ফুল। স্বামী, মেয়ে, আত্মীয়ের সাথে শুধুমাত্র ফোনে আলাপ। কেউ বেড়াতে আসে না, আসবে বা কি করে!? পাশের বাসার রুনু মাসি ও ক'দিন থেকে একঘরে হয়ে গেছেন। নাহলে তো সেই সকালে চায়ের কাপের নিত্য দাবিদার থাকতেন। রুনু মাসির একমাত্র ছেলে ব্যাংগালুরুতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে সেখানে সেও আটকে আছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। নিজের আর আত্মীয় পরিজনের সংকটকালে সুহানা কোন পথে যাবে নিজেই ভেবে পায় না। কালবৈশাখী বিকেলের মতো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারপাশ, নিজের মনের কথা ভাগাভাগি করে নেওয়ার মানুষজন আজ এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বসবাসকারী। রাতে ঘুমোতে গেলেও দুঃস্বপ্ন এসে ভিড় করে চোখের সীমানায়। মাঝরাতে আঁৎকে উঠে ঘুম থেকে ঝিঁঝিঁ পোকা আর ঘাড়ো ব্যাঙের কোরাস ডাক কর্ণকুহরে ঢোকে মনে করিয়ে দেয় সোমালিয়ার অভুক্ত শিশুর মৃত্যু চিৎকার।...

ঘরে মজুত রসদ প্রায় শেষ হওয়ার পথে, আশপাশের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে অনেকটা কমে গেছে। তাতে কি! বিন্দুমাত্রও আফসোস নেই সুহানার। মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলে তার মন আত্মায় তৃপ্তি আসে আর এটাতে যে সর্বসুখ। আজ বুধবার, সুহানা খুব প্রাতে শয্যাত্যাগ করে, হাতমুখ ধোয়ে তারপর ঈশ্বর আরাধনার কাজটা সম্পন্ন করে। তারপর চা, সকালের নাস্তা রেডি করে রাসেলের ঘুম ভাঙান। চোখ কচলে কচলে রাসেল মাকে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা আসেননি?" একটা দীর্ঘশ্বাস

নিয়ে মা বললেন, কি করে আসবেন বল্? হাসপাতালে রাতদিন ডিউটি তাছাড়া যে কারোর সাথে ঘুরাফেরা উঠাবসায়ও লাগাম। সেদিন ফোন করে বলেছেন আগামী ২১তারিখ ঘরে ফিরবেন। রাসেল ম্লানমুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, টপটপ করে কয়েকফোটা অশ্রু গাল বেয়ে নীরবে পড়তে থাকে। জন্মের পর থেকে সে এই প্রথম এতোদিনের জন্য বাবার স্নেহ আদর থেকে বঞ্চিত। খাঁচায় বন্দি পাখির মতো চটপট করতে থাকে রাসেল। বাবার আদর স্নেহ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজেকে বড্ড অসহায় বোধ করছে। বাড়ির বারান্দায় বসে সকাল দুপুর, নির্জন নীরবতার ভয়ংকর চিত্র গ্রীলের ফাঁক দিয়ে যেনো সবসময় তাড়া করছে। পথচলতি মানুষের হাঁকডাক, গাড়ির আওয়াজ, এসব যেনো কোন এক সাগরের অতলে লুকিয়ে আছে। বেলা বারোটা, মধ্যাহ্ন ভোজন রেডি করে মা রাসেলকে ডাক দিলেন। রাসেল! রাসেল! এসো বাবা! খাবার খেয়ে নেই। মায়ের ডাকে রাসেল ডাইনিং টেবিলের পাশে গিয়ে বসে। আজ তিনটি চেয়ার ফাঁকা, খেতে গিয়েও সে একাকীত্ব বোধ করে। অন্যান্য দিন রুনুমাসিও থাকতেন, রূপকথার গল্প - হাসিঠাট্টায় জমতো টেবিল। এমন সময় ঘরের মোবাইলে একটা লম্বা রিং, রাসেল ফোনটা রিসিভ করলো, হ্যালো! বাবা কবে আসছো? এই তো ব্যাটা, দু'একদিনের মধ্য আসছি। তুমি কেমন আছো রাসেল? কেঁদো কেঁদো সুরে ভালো আছি। রাসেল ফোনটা মায়ের হাতে দিলো। হ্যালো, কেমন আছো? কবে আসছো? অপ্রান্ত থেকে কোমলসুরে, তুমি চিন্তা করো না...আমি চৌদ্দদিন পরে বাসায় আসছি। আর হ্যাঁ, এই ক'টা দিন সাবধানে থেকো। বাইরের কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করোনা কিন্তু। আর রাসেলের খেয়াল নিও, ওকে খুব খুব মিস করছি বলে লাইনটা কেটে দিলেন। খাবার শেষ করে আজ সুহানা যেনো একটা অস্বস্তিবোধ করছে। সময় আজকাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। পরিবার পরিজন, আত্মীয় শুধুমাত্র ফোনালাপে একত্রিত হন। নয়নভরে দেখার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অজানা আতংক সবসময় ঘিরে আছে চারপাশ। কবে অবসান হবে নিঃসঙ্গতার। কবে স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসবে পিরিস্থিতি! রুজি রুটির তাগিদে কবে বেরুবো মানুষ!... এসব ভাবতে ভাবতে একসময় সুহানা ঘুমিয়ে পড়ে।...

◇◇◇◇◇

WITH BEST COMPLIMENTS FROM--

ARMIN CONSTRUCTION & SUPPLIER

Building Materials Supplier Assam

Various Brand Tmt Bar And Cement

❑ JSW Neosteel ❑ Shyam Steel ❑ Tata Tiscon ❑ Durgapur Steel ❑ Elegant ❑ Shree Ji Steel

Various Brand Cement

❑ Star Cement ❑ Dalmia Cement ❑ Ultra Tech ❑ Ambuja Cement ❑ Amrit Cement

Hard Construction Materials

❑ MS Angal ❑ MS Beem ❑ MS Scure ❑ MS Plate ❑ MS Round ❑ MS Sheet

Our company has been operational since 2020 for the betterment of the state of Assam and the whole of Northeastern for the public interest.

ANSARUL CHOUDHURY
MANAGING DIRECTOR
ARMIN CONSTRUCTION & SUPPLIER.
Construction Materials Supplier &
various Brand Tmt Bar & Cement. Assam
Contact No. +91 93953 96933

যোগাযোগ
08062181321
গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র

GODOWN
* Hailakandi Monacherra
* Silchar Nagatila
* Guwahati Lokra Gorchak

* (Supper Sales)
* https://www.arminconsupp.com
* ceo@arminconsupp.com
* Support Team 08069645260

মিনাজ হোসেন মাঝারভুঁইয়া
ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, হাইলাকান্দি (কাস্টমার সাপোর্ট)
ফোন নম্বর - **8062181321**

Our company Materials Transportation Free Under 30 Km. https://www.arminconsupp.com ceo@arminconsupp.com

বিড়ম্বনা

বিজয়িনী ভট্টাচার্য

শরতের তপ্তরোদে ঘেমে নেয়ে বাড়ি ফিরেছি যখন ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে চারটে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। দরজা খুলেই দেখি রুবি, আমার হেল্পিং হ্যান্ড ঠান্ডা জলের বোতল নিয়ে আমাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কি ব্যাপার! মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, কি জানি কি আছে কপালে! আগামীকালের ছুটি, নাকি অন্য কিছু। রুবির হাসিমুখ আমার কপালে ভাজ ফেলে দেয়। কারণ আমি জানি নিশ্চয়ই আমার জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে।

কোনভাবে ঘরে ঢুকতেই রুবি আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে জলের বোতল ধরিয়ে দিল। গদোগদো হয়ে বলল, যে গরম, জল খাও গো বৌদি, আরাম পাইবায়। আমিও হেসে বললাম, অয় অয়। জলের বোতল হাতে নিয়ে আমি সোজা হাঁটা দিলাম রান্না ঘরের দিকে। বোতলটা টেবিলে রেখে বেসিনে গিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে আবার এসে বোতল থেকে ঢক ঢক করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে চেয়ার টেনে রান্নাঘরেই বসতে যাব, আবার হাসিমুখে রুবি এসে হাজির। ওনো না, এসির তোলে বইবায়। এর আগে ড্রেস ওখান বদলি লাও। আমিও বাধ্য মেয়ের মত রুবি কথা শুনে গা-হাত-পা ধুয়ে, চেঞ্জ করে, এসির রুমে গিয়েই বসলাম। হাসি হাসি মুখে এক গ্লাস শরবত নিয়ে রুবি হাজির। ওউ নেও, লেবুর শরবত খাও। আমার কৌতুহল আরো বেড়ে গেল। আমি এখন প্রায় নিশ্চিত, রুবি কালকে আসবে না। শরবত নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কয় দিনের ছুটি লাগে।

রুবি প্রায় তেড়ে এসে বলল, আমি কিতা খালি বাদ দেইনি! আমার ঘাড়ে এতটা মাথা নেই যে রবির সাথে দ্বিমত পোষণ করি। সাথে সাথে বললাম, না না, ই কথা কইছি নি! এবার, ঠোঁটের কোনে হাসি ঝুলিয়ে আমি জানতে চাইলাম, রুবি, হইছে কিতা! ব্যাপারটা কও ছাইন! রুবি খুব খুশি হয় আমার পাশের চেয়ারে বসলো। হাসিমাখা মুখে বলল, বৌদি, তুমিতো যে সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরো, মাইনষে অলাও কইন তুমি বুলে এক্সপেট! আমি একটু হোঁচট খেলাম, বলে কি, এক্সপেট, এটা কি। বললাম, কিতা কও! রুবি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল, ওউ কিতা কইন নানি, ওউ যে, সব তা জানলে কইন ওখান কইআর। বুঝলাম শ্রীমতি বলতে চাইছেন এক্সপার্ট। বেশ খুশি হয়ে বললাম ও, কও। শ্রীমতি বললেন, কই আর পূজা তো আইছে, আমারে এখান হ্যান্স শাড়ি দিবায়নি!

হ্যান্স কোন শাড়ি, মনে মনে ভাবছি। জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছি না কারণ একটু আগেই পাওয়া এক্সপার্টের খেতাব যদি হাতছাড়া হয়! একটু ট্যাক্টফুলি জানতে চাইলাম, কি রকম ডিজাইনের মধ্যে চাই। উত্তর এলো, থুরা রংচংগা মুকা, কিন্তু বেশ কাজ না। ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে খুব একটা পরিষ্কার হলো না, হ্যান্স বলতে আসলে রুবি কি ধরনের শাড়ি চাইছে। বললাম, আরেকটু কও চাইন। রুবি বললো, লালটি মুখা বেজান আছে, এবার থুড়া কচুয়া মুকা দেখিয়া দিও। পড়লাম আরেক সমস্যায়, আমার রুবির কাছে কচি কলাপাতার রং, বটোল গ্রিন, সী গ্রীন সব রকম সবুজই কচুয়া। আবার বলল, লগে ম্যাচিং বেলাউজ, নক পালিশ আর জুতা দিবায়।

আমি বাকি সব বাদ দিয়ে হ্যান্স এর রহস্য সমাধানে বসলাম। কোন শাড়ি হতে পারে ভেবেই চলেছি। জর্জেট, শিফন, সাউথ কটন, খাদি, সিল্ক, কোনটা যে এই হ্যান্স সেটাই ভেবে চলেছি। আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে রুবি আশ্বস্ত করে বলল, বেশ দামি দিওনাগো। তুমার যেকসন আছে ওলা দিলেউ অইবো। আমি হাতে চাঁদ পেলাম, হেসে রুবিকে বললাম, দেখি আনোতো আমারটা। কিছুক্ষণ পরে রুবি একটি লিন্যান হ্যান্ডলুম শাড়ি নিয়ে ঢুকলো। আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, ওলাখান দিলেউ অইবো।

◇◇◇◇

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
কামনা করি, পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক।

প্রকাশ চান্দ সুরানা
সভাপতি, গৌতম রায় ফ্যানস ক্লাব, লালা।

এই প্রেম গল্প নয়

কবীর মজুমদার

মানুষ একটা সময় শান্তি চায়। পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হৈ হুল্লোড় তাকে আর প্রভাবিত করে না। ভালবাসাও তাকে বিমোহিত করে রাখতে পারে না। নির্দিষ্ট কারোর মায়াও তাকে আর আকৃষ্ট করে রাখতে পারে না। সে তার হয়ে যায়। জীবনের সব প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ভুলে প্রগাঢ় শান্তির খোঁজ করে। তখন তার আর নতুন করে কোনকিছু পাবার লোভ থাকে না। সব আশা উদ্দীপনা যখন খতম হয়ে যায় তখন সে বিদায় চায়। বিদায় শব্দটাই বেদনার। আমাকে তেমনি এক বেদনার নীরব সাক্ষী করে গেল সাগর। অসীম শূন্যতায় ভাসিয়ে দিল শেষে। অথচ একসময় কি রঙ ঢঙ ছিল সাগরের। প্রেমের ঢেউয়ে উতলা হয়ে উঠেছিল বুক । আর তখনি এক অসম প্রতিপক্ষ হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল নীল। ভালবাসার কাঙাল। কত আবদার ছিল আমাকে ভালবাসার। আমি ইলোরার স্বপ্নে বেকাবু হয়ে উঠলো সে। উঠবে নাই বা কেন! ইলোরা নামের সুন্দরী আর ক'জন কোথায় আছে?

আমি অহঙ্কার করি না, আগেও করতাম না। কিন্তু বরাবর অহঙ্কার করার মতো চেহারা আমার। তাতেই মজে ছিল নীল। হয়তো আমার টানা টানা চোখে কামনা বাসনার টানকে উপেক্ষা করতে পারেনি। স্বপ্নে ধরতে চেয়েছিল ভালবাসার হাত। সাঁতার কাটতে চেয়েছিল গোলাপি সরোবরে। সময় সেই সুযোগ দেয়নি। আমিও কাবু দিইনি। আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নীল। বিয়ে হয়ে গেছে আমার। কিন্তু আমরা কেউই কারোর কাঙ্খিত ভালবাসাকে জয় করতে পারিনি। পারিনি ভাগ্যের নির্মম বিচ্ছেদ খণ্ডাতে। জীবন আজ রূপকথার গল্প হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রেম গল্প নয়।

বিয়ের পর প্রতি বছর মহালয়ার আগে একটি মানুষের স্নেহ জড়ানো শুভেচ্ছা বার্তা পেতাম আমি। তিনি চমৎকার হরফে বাংলা লিখতেন। কোন পুজোয় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেবল এবারের দুর্গোৎসব ছাড়া। এবার কী হয়েছে জানি না। তিনি বোধহয় নিরূপায় হয়ে একা একাই পুজো উদযাপন করেছেন। নতুবা তিনি আর এই ধরাধামে নেই। হে রাম! এমন কথা কানে নিতে চাই না আমি। তিনি যে কী পরিমাণ স্নেহ করতেন আমাকে তা লিখে বোঝাতে পারবো না। আসলে তার ভরসার মানুষ কেউ নেই। একটা জীর্ণ বাড়িতে তিনি থাকতেন। তার বাড়ির অদূরেই শান্তিবন শ্মশানঘাট। সেখানে চিতাভস্মে অনন্তে বিলীন হয়ে গেছেন তার আত্মীয় পরিজনেরা। জীবিতরা কাছে থাকলেও মনের মতো কাছের কেউ নেই। তিনি একা। ভীষণ একা।

এই ভরপুর পৃথিবীতে অনেক আগেই একা হয়ে গেছেন তিনি। ক্ষণে ক্ষণে কাঁদেন। "ইলোরা, মা আমার! কিছুই ভালো লাগছে না রে। আমি কি করবো মা? আমার এখন এত নিঃসঙ্গ লাগে কেন?" আমি তাকে ঠিক বোঝাতে পারি না। আবার দূরেও ঠেলতে পারি না। কত শত স্মৃতি। যেদিকে তাকাই শুধু হৃদয় পোড়ানো স্মৃতি আর স্মৃতি।

মায়া মমতা খুব খারাপ একটা জিনিস। মাঝেমাঝে টের পাই। বুকে ভারী পাথরের ওজন অনুভব করি। আমি এক অসহায় নারী। প্রেমের ঋণে জর্জরিত। শোধ করবার ক্ষমতা নেই। প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে ভুগছি। নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় স্বার্থপর ও বেইমান মনে হচ্ছে।

তখন কলেজে পড়তাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের একটা ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্বসুলভ ভাব ছিল। ক্রমে সেটা ভালবাসার দিকে গড়ালো। আমি মানুষটাকে সীমাহীন ভালবাসতে লাগলাম। আমি জানতাম না আমার পেছনে ওৎপেতে রয়েছে আর একজন। আমি সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। পারার কথা নয়। কারণ সে আমার মন মন্দিরের কোথাও নেই। ছিলও না। বয়সের দিক দিয়ে অনেক ছোট।

খুব কাছাকাছি ছিল আমাদের বাসা। সে আমাদের ঘরে আসতো। আমি তার দাদীমার ডাকে যেতাম। তার আপন বলতে এই দাদীমা সাবিত্রীই সব। এক সড়ক দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা একই দিনে পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। সে তখন মাধ্যমিকের ছাত্র। মা-বাবার সঙ্গী হয়নি বলেই বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছে। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে বলে বেঁচে আছে এখনো। তার দুঃখ বলবার নয়। আমার দুঃখও ফেলে দেবার জায়গা নেই।

নীলকে দেখভাল করতেন দাদীমা সাবিত্রী। শান্ত মনের সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিতা মহিলা তিনি। হাতের লেখাও সুন্দর। মা-বাবার অভাবের আঁচড় নীলের গায়ে লাগতে দেননি তিনি। নীল মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে আসে। গল্প গুজব করে। পড়াশোনার সাহায্য নেয়। নম্র ভদ্র ছেলে। অন্য কারোর সাথে তেমন মিশে না। বন্ধু বান্ধব আড্ডা ইয়ার্কিতেও নেই সে। বেশির ভাগ সময় পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই অমায়িক ছেলেটাও যে কালে ভাদ্রে আমার পেছনে পড়বে আমি অনুমান করতে পারিনি।

আমার তো সাগর আছেই। সাগর থাকতে আমি নদীর প্রতি আসক্ত হবো কেন? ভাললাগা ব্যাপারটাই আলাদা। সেখানে কম্প্রোমাইজ করা যায় না। আর আমি তো কচি খুকি নই যে কলা দেখে বা লেভেনচুষে পটে যাবো।

নীলের আচরণে আমি মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। আমি ভুল অনুমান করছি নাকি নীল আমাকে ভুল সিগন্যাল দিচ্ছে বুঝতে পারতাম না। যাকে সন্দেহ করার নয়, তাকে সন্দেহ

করে আমি কি হীনমন্যতার শিকার হচ্ছি? এই প্যায়ার বেয়ার ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে!

সাগরের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা বাড়তে লাগলো। মতের বনিবনা মজবুত ছিল বলেই একে অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাবার বাসনা তীব্র হয়ে উঠলো। আমি মন দেওয়া নেওয়ায় প্রবল বিশ্বাসী ছিলাম। তবে আমার জীবনের রাশ বাবা-মায়ের হাতে ছিল। নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গনা বলে উল্লেখ করলে কেউ আমাকে অস্কার দেবে না। সত্যি বলে যদি পিতলের খুন্তিও পাই তবুও আমার আপত্তি নেই।

ভালবাসলে মানুষ কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে, স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পেখম মেলে উড়তে সাধ হয়। তখন সময় যেন ফুরাতে চায় না। গোপনে প্রিয় মানুষটিকে ভাবতে গেলে থামবার ইচ্ছে করে না। কেবল তার সাথে ভাসতে ইচ্ছে করে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে মন উড়ুউড়ু বাহানা ধরে।

সম্পর্কে জড়াবার পর থেকে সাগর আমাকে বিশেষ ভাবে কেয়ার করে। আমিও তার ডেয়ার এ্যাণ্ড নেয়ার হবার চেষ্টা করি। রেজাল্ট খারাপ হবার আশঙ্কায় সে আমাকে টিউশনি করতে বারণ করে। আর আমি স্বপ্ন দেখি- খারাপ হলেই বা কী, আমি ভালবেসেছি! ভালবাসবোই। কত কথা ইশারায় তাকে বোঝাতে চাই। স্বপ্নে একদিন সেই সুযোগ আসে। তালে তাল মেলাই। তাকে নিয়ে শিলং ঘুরতে যাই। পাহাড়ি রেস্তোরাঁয় বিরিয়ানি খাই। হোটেলে সারারাত রঙ্গরসে কাটাই। এমন ভালবাসা আদায় করি যে, সে রাতে সাগর আমার প্রশান্ত দিঘিতে মিশে হুঁশ হারিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ে। তাকে টেনে তুলে বাথরুমে নিয়ে যাই। দুবার সাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে তিনঘণ্টা অবধি হাঁচি দিতে থাকি। ভালবাসার সে কী নেশা পই পই করে উপলব্ধি করি। আর ন্যাকামির নাটক করা যাবে না। সাগরও আমার কাছে সাধু সাজতে পারবে না কোনদিন। 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি' বলার দিন শেষ। উঠতি যৌবনের বাড়তি স্বপ্নের পরিসমাপ্তি।

ভালবাসা তো ভালবাসাই। কিন্তু নীলের গল্প সবে শুরু। এই আপদের ভূত মাথা থেকে নামাবো কী করে? আমি তো দুনিয়ার পুরুষের টিকা নিতে পারি না। এমন হলে আমি আর বারবনিতার মধ্যে তফাৎ কী! এতটা অসতী হয়ে কাউকে ভালবাসা যায় না। অপবিত্র দেহমন নিয়ে সত্যিকারের প্রেম হয় না।

সাগরের সঙ্গে আমার অনেক জড়তা কেটে গেছে। এখন কাছাকাছি বসে গল্প করতে পারি। কাঁধে হাত রেখে সামনের সোনালি দিনের পরিকল্পনা রচনা করি। ভালবাসার কত দাবি। না, সেদিকে যাওয়া হয়নি। দিল্লির লাড্ডু খাওয়া হয়নি। স্বপ্নজগতে বিচরণ করাটাই সুখের। চেটেপুটে খাওয়া প্রেম বেশিদিন টিকে না। আমার প্রতি সাগরের আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। আমিও ঝুঁকতে লাগলাম তার দিকে।

একদিন সকাল বেলা নীল এসে হাজির আমাদের ঘরে। সে প্রায় সময় আসতো। আমার সঙ্গে যেচে কথা বলতো। বয়সের তফাৎ ছিল বলে কারোর মনে কোন সন্দেহ জাগতো না। আমিও তাকে সংশয় করতাম না। জানতাম সে ভাল ছেলে আর ছিলও তাই। মিথ্যে কথা বলার ধাত ছিল না। আমার কথা মানতো। আমি কিছু বললে তা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতো। বেশ বাধ্য ছেলের মতো হাবভাব। কী যেন বলবার সাহস জোগাচ্ছে। ইদানিং নীলের মধ্যে কেমন একটা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করছি। যে ছেলেটা পারতপক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মিশে না বা তেমন সড়গড়ভাবে কথা বলতে পারে না তাকে কেমন জানি বেপরোয়া মনে হচ্ছিল আমার। বুঝতে প্রবলেম হবার কথা নয়। এই বয়সেই অল্প স্বল্প ঠেলা ধ্বাক্কা খেয়েছি আমি। অভিজ্ঞতার ঝুলি একেবারে খালি নয়। দূর থেকে ছেলেদের মতিগতি পড়তে পারি। নীল তো কাছের বাসার মানুষ।

আমার ভাবনায় অমিল ঘটেনি। নীলের মুখ থেকে কিছু আবোল তাবোল কথা শোনার পর আমার সন্দেহ চাগাড় দিয়ে উঠলো। পরবর্তী কথার মোড় কোনদিকে যাবে তা আগেই আন্দাজ করে নিলাম। সে হিসেবে প্রস্তুত থাকলাম। মনকে শান্ত রেখে ভাবলাম- আমার অনুমান গলত হতেও পারে। কিন্তু পরক্ষণে নীলের কথার সারবস্তু বুঝে আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেল। এ কী বললো ছেলেটা! আমি আর শান্ত থাকতে পারলাম না। কী শোনলাম আমি! ভালবাসার নামে আমাকে ঘোর অপমান। এতোটা সাহস সে সঞ্চয় করলো কিভাবে? ইচ্ছে হয়েছিলো- এক থাপ্পড়ে দাঁতের পাঠি গুড়িয়ে ফেলার। ভাগ্যিস, সেটা করিনি নতুবা ঘটনা লম্বা হতো। লোক জানাজানি হয়ে যেতো পুরো ব্যাপারটা।

আমার রণচণ্ডী ভাব দেখেও দাঁড়িয়ে রইলো নীল। যেন মার না খেয়ে যাবেই না। কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো- তুমি ভুল বুঝলে ভুল আর শুদ্ধ ধরে নিলে সোনায় সোহাগা! আমি তোমাকে ভালবাসি। বেহদ ভালবাসি। আমার ভালবাসায় কোন খামতি নেই। তুমি ছাড়া আমার চলবে না।

শুনে তো মাথা ভনভন করতে লাগলো। এখনো ঠিকমতো গোঁফ ওঠেনি আর সাত বছরের ছোট ছেলেটার স্পর্ধা দেখো। নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। বললাম- নীল, দ্বিতীয়বার আর কোনদিন একথা মুখে আনবে না। তোমার লজ্জা হয় না এরকম কথা উচ্চারণ করতে? আমি এক্ষুনি সাবিত্রী মাসীর কাছে গিয়ে নালিশ করছি...।

একটুও নরম শরম হয়েছে বোঝা গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো নীল। ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো- তুমি রাগ করো বা মারো। আমি তোমার পিছু ছাড়বো না। বুঝলাম সিধা

আঙুলে ঘি উঠবে না। ধমকের সুরে বললাম- তুমি এত নির্লজ্জ হলে কী করে? আমার পেছনে পড়ে লাভ নেই। আমি নিজেই আর একজনের পেছনে ঘুরি। শুনে থতমত খেয়ে গেল নীল। যেমন কুকুর তেমন মুগুর পড়েছে। তবুও দেখি বেহায়ার মতো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। জীবনে সুন্দরী মেয়ে না দেখা পুরুষও এমনভাবে তাকাতে পারে না। কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বললো- তুমি বললেই হলো? ঈশ্বর আমার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি তোমার অপেক্ষা করবো।

এত গায়ে পড়া ভাব বরদাস্ত করতে পারলাম না। প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘর থেকে বেরকরে দিয়ে বললাম- চলে যাও নীল। তোমার মতো নোংরা মানসিকতার মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। কোথায় কি বলতে হয় জানো না। আমি তোমার থেকে সাত বছরের বড়!! যেতে যেতে আমার দিকে কয়েকবার ফিরে তাকালো। অদূরে গিয়ে বললো- আমার কী অপরাধ! ভগবান আমাকে সাত বছর পরে পৃথিবীতে পাঠালো কেন? তুমি আমাকে জ্ঞান দিতে পারো, মন দিতো পারো না? বড় নাছোড়বান্দা এক আদম। তার এই প্রশ্নের জবাব আমি দেবো কেন? আমি তার জন্য পয়দা হয়েছি এই পোক্ত ধারণা তার মগজে জন্মালো কী করে! আমি সাগরের জন্য। পৃথিবীর বাকি সব পুরুষ আমার কাছে গৌণ। আমার এবং সাগরের প্রণয় উপাখ্যান পারফেক্ট ম্যাচ করেছে। মাঝখান থেকে 'দ্য প্রবলেম' এক সমস্যা নাজিল হলেই হলো? নীলকে কিভাবে দমানো যায়।

বিকেলে নীলের ঘরে গিয়ে তার দাদীমার সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বিগড়ে যাওয়া নীলের সবকথা খুলে বলে নালিশ জানালাম। তিনি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম নীল চুপচাপ বিছানায় পড়ে আছে। জ্বরে বেকাবু। সাবিত্রী মাসী আমার হাতে ধরে কী যেন বোঝাতে চাইলেন। বললেন- সকাল থেকে কিছুই খাচ্ছে না। ডাক্তার দেখাতেও নিয়ে যেতে পারছেন না। সারাক্ষণ নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার তাতে কী! তার বাহানা আমি আগেই বুঝে ফেলেছি। পাত্তা দিলে বিপদ। এই নাটকের নায়িকা হওয়া যায় না। নীল বিষয়টাকে খিচুড়ি বানাতে চাইছে। কোনও না কোনভাবে সহানুভূতি আদায় করে মনস্কামনা পূর্ণ করার জেদ ধরেছে। আমার ব্যাঙ! আমি ব্যস্ততার ভানকরে কেটে পড়লাম। দুদিন পর সাবিত্রী আমাদের ঘরে এলেন। আমার সাথে হাল্কা কথা বললেন। নীলকে নিয়ে কী করা যায় পরামর্শ চাইলেন। আমি কি সুরাহা দিই তাকে। সে নাকি কিছুই খাচ্ছে না। পড়াশোনা করছে না। আর মোদ্দা কথা আমাকে না পেলে সে নাকি বাঁচবে না। মহা ঝামেলা তো! আমি এখন কী করি। তিনি তার নাতির ধান্দা ভালোই বুঝতে পেরেছেন। তাই অন্য কারোর কাছে না গিয়ে সোজা আমার দ্বারস্থ হয়েছেন। আমি তাকে সম্মান করি। বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি আমাদের পাড়ার এক সহায়ক। প্রতিবেশিদের কাছে তার আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। তিনি হয়তো কৌশলে সেই সুযোগটা নিতে চাইছেন। আমি এমন একটা বেকায়দায় পড়লাম যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। তিনি চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমাকে বললেন- মা ইলোরা! তুমি আমার ভরসা। আমার নাতিটার যেন কিছু না হয়। কত বড় সমস্যা! একবার ভাবুন তো!

তিনি চলে যাওয়ার পর মা আমার কাছে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন! মা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সাবিত্রী মাসীর আগমনে তার মনে কি জানি একটা সংশয় উঁকি দিয়েছে। তবে নীলের বিষয়টা মা আঁচ করতে পারেননি। আর আমিও চাই বিষয়টা চাপা থাক। কারণ এ ব্যাপারে যত ক্যাচানো হবে ততই অপবাদ ছড়াবে। মানুষের মুখে আলোচনার খোরাক জোগাবে। লজ্জিত হয়েও সাবিত্রী মাসীর কাছে না বলে পারিনি। বেহোরা নীল কী যে গো ধরেছে! আমাকে না পেলেই যেন তার না হয়। এভাবে কাউকে চাইলেই কী কারবার হয়ে যায়? একতরফা ভালবাসা আদায় হয়? পছন্দ সমতা এসবের কী কোনও গুরুত্ব নেই।

কয়েকদিন হয়ে গেছে। নীল একবারও আমাদের ঘরে আসেনি। তার এই অনুপস্থিতি মায়ের সন্দেহের উৎস হলেই চরম বিপত্তি। আমি কীভাবে কাকে সামাল দেবো বুঝে উঠতে পারছি না। দুপুরে চুপিচুপি সাবিত্রী মাসীর ঘরে গেলাম। পরিবেশ একেবারে নিস্তব্ধ। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। মনে হলো- তার ভীষণ চিন্তা লাঘব হতে চলেছে। ফোলা ফোলা চোখে আমাকে দেখে জানতে চাইলেন কেমন আছি। তারপর ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন- সাগর ছেলেটা কে মা? আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম! তারমানে আমার সমন্ধে সব তথ্য জানা হয়ে গেছে তার। নাতি-দাদীমার আলাপচারিতার বহর আন্দাজ করলাম। এখন যে আমার না ফেঁসে উপায় নেই। বিষয়টা মায়ের কানেও যেতে পারে। পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেবে কে জানে। সাগর আমার সম্পর্কীত একজন বলেই এড়িয়ে গেলাম। প্রসঙ্গের রূপ পাল্টাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম- নীলের খবর কি? তিনি যেন হাতে মোয়া পেলেন। আমার হাতধরে ওর কক্ষে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বিছানার সাথে লেপ্টে রয়েছে নীল। এই ক'দিনে একদম শুকিয়ে গেছে। সাবিত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- ঔষধ তো পরের কথা, দানাপানি মুখে তুলছে না। বুঝলাম- ক্রমে ঘটনা জটিল আকার ধারণ করছে। আমি এতটা কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম ধমক দিয়ে না করে দিলেই ভালবাসার ভূত মাথা থেকে নেমে যাবে। এখন দেখছি প্রেমের জীন-জিন্নাত সব মাথায় উঠে বসেছে

তার। আর একই অজুহাতের ভূত পেরৎ সাবিত্রীকে উস্কে চলেছে। জঞ্জাল বোধহয় একেই বলে।

আমার কী হবে! চোখের সামনে প্রিয় সাগরের ছবিটা ভেসে উঠলো। ক'দিনই বা আর হলো আমাদের ভালবাসার। এরই মধ্যে আমার জন্য কিনা করেছে মানুষটা। আর প্রয়োজন পড়লে সে কিনা করবে সেটাও জানি। একটা গভীরতম আপন আপনভাব জমে গিয়েছে তা কি নীলের ঠেলায় শেষ হয়ে যেতে পারে। যে মানুষটা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে তাকে কী কারোর চাপে ভোলা যায়? সাগর আমার প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আমি ভালবাসার ফায়দা নিইনি। ভালবাসার মানুষকে সফল করতে সে নিজের থেকেই তা করে। তার সাহায্যার্থেই আমি অনার্স কমপ্লিট করেছি।

সাগর বড়লোক নয়। তবে তার মনটা মহাসাগরের মতো বিশাল। আমার গর্ব হয়, মনের মানুষ চিনতে ভুল করিনি আমি। কিন্তু নীলকে কাছে থেকেও চিনতে পারিনি। বুঝতে পারিনি। ও যে একসময় বড় গোলমাল বাঁধাতে পারে সেকথা কোনদিন ভাবিনি। নীলের মতো শান্ত ভদ্র ছেলের মধ্যেও যে প্রেমের দপদপানি থাকতে পারে তা আমি বড্ড অসময়ে টের পেলাম। অথচ আমার করার কিছু নেই। শ্যাম রাখি না কুল রাখি- এই অবসহায় আমাকে শ্যাম রাখতেই হবে। কারণ আমি আপেল পেয়ে গেছি আনারসের দরকার কী। আর খায় কম দেখে বেশি প্রকৃতির বেহায়া ছেলে আমি হজম করতে পারি না।

ভীষণ গোলকধাঁধায় পড়লাম। আমার ও সাগরের সম্পর্ক এবার পাঁচকান হবে। আমি দুর্বল হলে চলবে না। নীলের প্রতি কোনরকম দুর্বলতা প্রকাশ করলে সে আরও বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠবে। কিন্তু সে যে নিরেট গাধার মতো পেছনে পড়বে জানতাম না। বিছানায় শুয়ে ও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। কথা বলার সাহস করতে পারছে না। জীবনে অনেক পুরুষ দেখেছি, কিন্তু নীল একেবারে স্বতন্ত্র। তার চোখেমুখে যে কাঙালপনা ফোটে উঠেছে তাতে আমার ঘৃণা ধরেছে। সাবিত্রী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- ইলোরা, তুমি ওকে বোঝাও। এই ভব সংসারে কে আছে তার? আজ আমি আছি, কাল নেই হয়ে গেলে কে দেখবে তাকে! পড়াশোনা করে কিছু একটা করতে না পারলে বাকি জীবন কাটাবে কীভাবে? আমি হতবুদ্ধি। সাবিত্রী মাসীর কথার কী উত্তর দিতে পারি? আমাদের পরিবারের বিভিন্ন উটকো ঝামেলায় তিনি সমাধানের হাত বাড়িয়েছেন। টানাপোড়েনে সহায়তা করেছেন। তার এই পরিস্থিতিতে আমি অপারগ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কপালে হাত রেখে বললাম- পাগলামি ছাড়ো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ খাও। সুস্থ হয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করো। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো নীল। দাদীমা একটু সরতেই সেই একই কথা। বললো- আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবো। তুমি যদি আমার কথা রাখো। আমি কিছু বললাম না। এই শয়তানি আবদার রাখা যায়? ঘরে এসে একান্তে অনেক কথা ভাবলাম। নীল খারাপ নয়। বয়সে ছোট হলেও ছেলে ভাল। আমার প্রতি দুর্বলতা ছাড়া তার আর কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু সে আমার ভালবাসার মানুষ নয়। হতেও পারবে না। আমার কাছে সে যোগ্যতাহীন এক আপদ। আমি সাগরের, সাগর আমার। তার ভালবাসা আমাকে সুখী করেছে। মাঝপথে কাঁটা হয়ে এসেছে নীল। এই অন্তরালের প্রাচীর আমাকে টপকাতে হবেই। আমাদের ভালবাসাকে সাকার করতেই হবে। কী এক সঙ্গীন পরিস্থিতি আমার সামনে। এক ফুল দুই মালী। একজন আমার পেছনে পাগল আর আমি অন্যজনের পেছনে পাগলিনী। নীল আমার জন্য খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছে আর সাগর আমাকে প্রতিষ্ঠা করে জীবনসঙ্গিনী করতে চাইছে। নিজের ক্যারিয়ার গড়ার আগে আমাকে সাবলম্বী করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আমি একটি স্কুলে শিক্ষকতার জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছি। কমিটি দেড় লাখ টাকা চেয়েছে। এতো টাকা দেবার সামর্থ আমার নেই। নিশ্চয় চাকরিটা আমার আর পাওয়া হবে না। কথাটা সাগরের কানে গেছে। সে তার সাধের বাইকটা বিক্রি করে কমিটির সাথে যোগাযোগ করেছে। একথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। সাগর বলেছে- আমারটা হবেই। তারপর সে চেন্নাইতে চলে গেছে। একটি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দেবে সে। চাকরি হয়ে গেলে উভয় পরিবারের দরবারে আমাদের দাবি উত্থাপন করবো। সিদ্ধান্ত এরকমই।

ধীরে ধীরে নীল সুস্থ হয়ে উঠলো। এখন আর আগের মতো আমাদের ঘরে আসে না সে। তবে জেদ ছাড়েনি। নিশানা ভুলেনি। আমার প্রশ্রয় পায়নি বলে আপাতত দমে গেছে। এই দমে যাওয়া ঝড়ের লক্ষণও হতে পারে। ভেতরে ভেতরে আগ্নেয়গিরি দপদপ করে জ্বলছে সেটা আমার অনুমান। সে তার ঘরের জানালায় কখনো বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি থাকে আমাদের ঘরে। তার চোখেমুখে দহনের শিখা দেখি আমি। বুঝতে পারি এই আপদ পিছু ছাড়ছে না। মা আমাকে দু-একবার প্রশ্ন করেছেন- কীরে ইলোরা, সাবিত্রীর সঙ্গে তোর কি কোনও মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে? ও ঘরের নীলও দেখি এখন আর আসে না! ব্যাপার কী?

এত মারাত্মক একটা ব্যাপার বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমি জানি তিনদিনের চাঁদ হলে ঘরে বসে দেখা যায়। এই ব্যাপারটাও তাই হবে। আজ না হয় কাল, সব জানাজানি হয়ে যাবে। পরিণাম কী হবে কে জানে। আমি শুধু প্রার্থনা করি- আমরা দুজনের চাকরি হয়ে

যাক। ভালবাসা পরিপূর্ণতা পাক। স্রষ্টা সব পারেন। আমাদের ভাল-মন্দ সব তার হাতে।

সাবিত্রী মাসির ঘরে তালা। খবর নিয়ে জানলাম- তিনি অতিষ্ঠ হয়ে নীলকে দূরের একটা স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিয়েছেন। তিনিও সেখানে একটা ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন। খানিকটা স্বস্তি পেলাম। বুঝলাম বিধাতা আমার দিকে দয়ার চোখে তাকিয়েছেন। হলোও ঠিক তাই। স্কুলে আমার চাকরি হয়ে গেল। সাগর সেই খুশিতে চেন্নাইতে তার বন্ধু-বান্ধবদের মস্ত একটা পার্টি দিল। আমি তার সুসংবাদের অপেক্ষায় রইলাম।

আমাদের সম্পর্ক ভালই চলছিল। কখনো কল্পনা করিনি আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো। কিন্ত ভাগ্য বিরূপ ছিল। যাকে মনে ধরে তাকে কপালে ধরে না। আমার বাবা-মা বেশি হিসেবী মানুষ এবং যেভাবেই হোক নীলের ব্যাপারটা জেনে গিয়ে ছিলেন।

এমনি এক খারাপ সময়ে আমার বিয়ের সম্বন্ধ আসে। বাবা-মা কেন জানি দেরি করতে চাননি। তারা আমাকে না জানিয়েই বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এরপর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় পাত্রপক্ষের লোক এসে হাজির হয়। আমাকে দেখে তাদের পছন্দ হল এবং সেদিনই আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিল। আমার ভালবাসার স্বপ্নিল আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হবার পরে কনে পালিয়ে গেলে পরিবারের সন্মান হানি হয়। আমি সেদিকে যেতে পারিনি। আমি যদি সাগরের সঙ্গে পালিয়ে যাই তবে আমার ছোট বোনটিকে কেউ বিয়ে করবে না। পরিবারের সন্মান রক্ষায় আমি ভালবাসাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে বাবা মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে করে নিই।

আমার বিয়ের খবর পেয়ে নীল যারপর নাই কেঁদেছিল। সাবিত্রী মাসীও কেঁদেছিলেন খুব। একটি পরিবারে দুটি মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর পুজোয় তিনি প্রথমবার আমাকে একটা ম্যাসেজ দিলেন। ম্যাসেজ পড়ে যা বুঝলাম- নীল পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। তবে তিনি তাকে নিয়ে মহাসঙ্কটে আছেন। ইলোরা নামের ঘোর তার মগজ থেকে কাটেনি। যেন এক নামের ফকির সে। কখন কী করে বসে সর্বক্ষণ এই চিন্তা! বংশবাতি বলতে সে-ই একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। তার কিছু হয়ে গেলে তারও বাঁচা-মরা সমান। তিনি কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আমার বিয়ের কথা জানতে পেরে সাগরের একই অবস্থা। সে নাকি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। তবে ঈশ্বরের কৃপায় সে বেঁচে যায়। শুনেছি সে সাইবার ইঞ্জিনিয়ার পদে চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে যোগ দিয়েছে। তারপর আর কোন খবর জানি না। কারোর সাথে দেখাও হয়নি। প্রায় আট-দশ বছর হয়ে গেছে কারোর খোঁজ রাখিনি। খোঁজ রাখার মতো মুখ ছিল না আমার। চার বছর আগে ঊনিশের করোনাকালে আমার ছোট মেয়ের হার্টের ছেদ ধরা পড়ে। চেন্নাই নিয়ে যাবার দরকার হয় হার্ট অপারেশন করার জন্য। সেই সময়ে আমি ও আমার স্বামী আর্থিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি। চোখে সর্ষেফুল দেখার মতো অবস্থায় হঠাৎ দেখি- আমার স্টেট ব্যাংকের একাউন্টে পাঁচ লক্ষ টাকা কে যেন পাঠিয়ে দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম- সে আমার সাগর। কার কাছ থেকে জানতে পেরে বহু কষ্টে আমার একাউন্ট নম্বর যোগাড় করে এই টাকা পাঠিয়েছে সে।

চেন্নাইর একটি হোটেল থেকে বেরিয়ে অটোয় উঠবো এমনি হঠাৎ আমার আঁখি স্থির হয়ে গেল। সেই মানুষ! সেই চোখ-মুখ আর সুঠাম চেহারা। আমার ভুল হবার কথা নয়। পৃথিবীতে একই রকমের কী দুজন মানুষ হয়? ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। মানুষটা আমাকে দেখেও না দেখার ভান করলো। মনে হল কেউ চোখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না আর কেউ চোখ না থেকেও দুনিয়া দেখে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে তার বাবা অটোতে উঠে গেছে। দেখলাম মানুষটা মৃদু হাসছে। কিছু বলতে পারলাম না। বলার সাহস হয়নি। নিশ্চুপ অটোতে উঠে গেলাম। মগজে সাগরের কথা ঘুরপাক খেতে লাগলো। জানতাম- সে সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার পদে টিম লিডারের দায়িত্ব পেয়ে চেন্নাইতেই কর্মরত রয়েছে। সম্ভবত এই মানুষই সে। যার টাকায় মেয়েকে নিয়ে আজ আমরা চেন্নাই পৌঁছেছি। তারসঙ্গে দেখা হয়েও দু-কথা বলতে পারিনি। এরচেয়ে দুর্ভাগ্য আর আছে? নিজেকে নিজে গালি দিলাম। মন ভাল নেই। মেয়ের সার্জারি হবে।

পরের সপ্তাহে মেয়ের সার্জারি হল। অপারেশন সাকসেসফুল। বিপদ কেটে গেছে। আরও তিন চারদিন পর ঘরে ফেরা যাবে। মাথায় বারবার সাগরের মুখটা ভেসে উঠেছিল। কতটা অকৃতজ্ঞ আমি। মেয়েকে সুস্থ করেও এই কথাটা তাকে জানাতে পারলাম না।

ঘরে ফেরার কয়েকদিন পর আমার ম্যাসেঞ্জারে দীর্ঘ একটা ম্যাসেজ এলো -

প্রায় দশ বছর পর তোমাকে দেখলাম "রাজ রেসিডেন্সির" সামনে মেয়েকে নিয়ে অটোয় উঠতে। অনেক সুন্দর লাগছিল তোমাকে। মানুষ বলে -সময় পাল্টানোর সাথে সাথে চেহারাও পাল্টে যায়। কিন্তু তুমি তো সেই তেমনই রয়ে গেলে যেমন ছিলে দশ বছর আগে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি, ডাগর ডাগর চোখে গাঢ় করে আঁকা কাজল, লম্বা

কেশরাশি। সবকিছুই আগের মতো আছে। শুধু উদ্ধত বক্ষদুটি নুয়ে পড়েছে এই যা। আর বুঝলাম- তোমার ভেতর আমি সাগর নেই। তোমার দুইশ তিরাশি দশমিক ঊনপঞ্চাশ গ্রাম হার্টের হৃৎস্পন্দনে এখন অন্য এক পুরুষের শিরশিরানি। আমার দুঃখ হয়নি। দুঃখ হয়নি একারণে- আমি তোমাকে চোখবুঝে দেখতে পারি। কোথায় কটা তিল আছে দেখার সুযোগ হয়নি, তাইবলে আমার কোনও আফসোস হয় না। আক্ষেপ এটুকুই খুব কাছে থেকে দেখেও তোমাকে আলতো করে ছুঁতে পারলাম না। মুখোমুখি হবার পরও থেকে গেলাম হাজার মাইলের আলোকবর্ষ দূরে। একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনি। ডাকতে পারিনি ইলোরা বলে। কারণ তুমি আমার হয়েও আসলে আমার হলে না।

তোমার সেই চলে যাওয়া আমি আজও মানতে পারিনি। মনেহয় তুমি আমারই আছো। এমন এক ভয়াবহ ফ্যান্টাসি নিয়ে আমার দিন যায় রাত পোহায়।

তুমি ছেড়ে যাওয়ার পর আমি বন্ধুমহলে কতরকম মিথ্যে বলেছি। তোমাকে ইতি দিয়ে ফেলেছি। লাউয়ের আগা খেয়ে ছেড়ে দিয়েছি। আরও কত রকমের মিথ্যা বলেছি হিসেব রাখিনি। আচ্ছা, তুমিই বলো- তেরোশো থেকে চৌদ্দশো গ্রামের মস্তিষ্কে যে মানুষটা ভরকরে থাকতো তাকে কি চটকরে ভোলা যায়? রাজ রেসিডেন্সি থেকে বের হওয়ার সময় তুমি শাড়ির কুঁচি সামলাতে ব্যস্ত আর আমি চোখের জল থামাতে। এই বিরহ ব্যথাটুকু বারবার জানান দেয় -তুমি হারিয়ে গিয়েও মনের ঘরে ঘাপটি মেরে আছো । যখন বুঝি তুমি ছাড়া আমি অচল, তখন নিজেকে সামলানো দায় হয়ে যায়। জীবনের সবচেয়ে পবিত্র সাধ ছিল তোমাকে নিয়ে এক বিছানায় শুবো। তোমাকে আদিমতার ঢঙে ইচ্ছেমতো পরখ করবো। হয়নি, কিছুই হয়নি। সেই শখ মেটাতে কয়েকবার এ.আই. য়ের সহায়তা নিয়েছি। তোমার পুরনো ছবিথেকে তোমাকে মনভরে দেখেছি। এই একটু আগেও একবার তারিয়ে তারিয়ে দেখলাম। ঈর্ষা হলো। ঘৃণাও জন্মালো। পুরো নগ্নকরে দেখার পর বিতৃষ্ণা জাগলো। যে সুঠাম শরীরটা আমার হওয়ার ছিল তা না হওয়াতে দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেলো। সব মেয়ের যা থাকে, তোমারও তাই। তোমার রূপের মোহে আটকে গিয়েছিলাম, তাই শেষবারের মতো তোমাকে হলফ করে দেখেছি। ভালবেসে হারানোর পর যাচাই করেছি আরকি। এটাকে নোংরা মানসিকতা বলা যায় না। লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকেও সব বলে দিলাম। তুমি কিন্তু একথা কাউকে বলতে যেও না। এ লজ্জা তোমার আমার।

দুশ্চিন্তা করোনা ইলোরা। আর কোনদিন তোমার সামনে পড়বো না। জানো, সম্প্রতি আমার বিরাট পদোন্নতি হয়েছে। আমি মাইক্রোসফট ক্যালিফোনিয়া সাইবার সিকিউরিটি ইনিজনিয়ার পদের জন্য আমেরিকায় ডাক পেয়েছি। আগামী সপ্তাহে কাজে যোগদান করার কথা। কিন্তু জীবনের সব অগ্রযাত্রা বাতিল করে দিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি যাবো না। আগামীকালের সূর্যোদয় আমার আর দেখা হবে না। ভোর হলে চোখ খুলে লোকে আমার লাশ দেখবে। চিন্তা নেই। বিয়ে থা করা হলো না। হাসিমুখে বিদায় নিতেই পারি। ব্যর্থ প্রেমের দগদগে ঘা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। মৃত্যুই শ্রেয়।

ইতি- মৃত সাগর

দু-চোখ গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়লো। চোখের জল আটকাবার ক্ষমতা যেমন নেই তেমনি সাগরকে বলবার ক্ষমতা নেই- তুমি এভাবে নিজেকে শেষ করে দিও না। ভগবান কী আর একবার সাগরের এই প্রচেষ্টা রদ করবেন? নাকি সাগর শেষ হয়ে গেছে?

আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে সাগরের সাথে! যার ভালবাসায় ঋদ্ধ হয়েছি তাকে কি ভুলতে পারি! তার এত ঋণ আমি শোধ করবো কীভাবে?

<><><><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

সৌমেন ভট্টাচার্য
সভাপতি, এম ভি স্কুল শিক্ষক সংস্থা
হাইলাকান্দি জেলা

সন্ধ্যামনি

সীমারেখা দাস

এক যে ছিল রাজা, ঘুড়ি ঘুড়ি রাজা নয় যে রাণী, রাজা ছাড়া কি রাজ্য চলে না ? খুব চলে। বিশাল তাঁর বাড়ি। বিরাট তার দরজা। প্রতিদিন কত গরীব, দুঃখী তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কাউকেই ফেরান না। তাই সবাই বলে ‘জয় রাণীমা’। গেটের মাথার উপর আছে রোশন চৌকি। যেখান থেকে ভোর বেলায় ভৈরবী আর সন্ধ্যায় পূরবীর সুর ভেসে আসে।

কিন্তু সেই বিরাট বাড়িতে মানুষজন বিশেষ নেই। কর্মোপলক্ষে কিছু লোকের আসা-যাওয়া থাকলেও বেশির ভাগ সময় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।

রাণীর সঙ্গী তার সাধের গোপাল। তাঁকে নিয়েই তাঁর সময় কাটে। রাণীর বাগানে অজয় সন্ধ্যামনি ফুল ফোটে। সারাদিনের কাজের অবসরে তারাই তখন তাকে সঙ্গ দেয়।

এই নির্জন নিঝুমপুরী জেগে ওঠে, শরৎকালে দেবীর আরাধনায়। তখন দূরদেশ থেকে ঠাকুর গড়তে আসেন পাল মশাই, ছেলেকে সঙ্গে করে। পাড়ার সমস্ত শিশু হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ঠাকুর গড়া দেখতে। প্রথমে কাঠামো তৈরি হয়। তারপর একমোট, দুমোট করে সেই কাঠামোর উপর মূর্তি গড়া এগিয়ে চলে। মূর্তি গড়া যত এগোয়, শিশুরা ততই আনন্দিত হয়ে ওঠে। আসন্ন দূর্গাপূজাকে কল্পনা করে। পূজা শুরু হলে দুর্গামন্ডপ শিশুদের কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। ছোটো-বড়ো সবাই নতুন জামা-কাপড় পরে, মন্ডপ আলো করে বয়ে থাকে। কত লোক সেই ঠাকুরদর্শন করতে মন্ডপে ভিড় করে। তখন বাড়িটা রাণীর আত্মীয়-কুটুমে ভরে ওঠে। কত হাসি-গান হয়। কত আমোদ আহ্লাদ হয়। কিন্তু তখন রাণীর কথা কারো মনে থাকে না।

কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিল, একটি শিশু। যে রাণীর জীবন নিয়ে কৌতূহলী ছিল। সে ভাবতো, রাণী কি করে, কি খায় কোথায় শোয়, কেমন ভাবে জীবন কাটায় - যেটা সে দেখবে, জানবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রূপকথার রাজকন্যার মতো তিনি সোনার খাটে গা, রূপায় খাটে পা দিয়ে শুয়ে থাকেন। আর সোনার থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ছাড়া তাঁর মুখে অন্ন রোচে না। তাঁর অপূর্ব দুধে-আলতা রঙ, দুধের পুকুরে স্নান ছাড়া সম্ভব নয় বলেই তার বিশ্বাস। অজস্র দাস-দাসী আছে নিশ্চয়, যদিও তাদের চোখে দেখা যায় না। তাতে কি আর অজস্র সোনা-মনি মুক্তার শাড়ির অলঙ্কার থাকবে তাঁর, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

কিন্তু রাণীকে তো দেখা যায় না। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকেন। তাই তার দেখা পাওয়া ভার। কিন্তু শিশুর কৌতুহলী মন, তাকে দুর্দমনীয় করে তোলে। তাই আড়াল-আবডাল থেকে যখনই কোনো সুযোগ পায়, তখনি তাঁকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাকে সবসময়ই হতাশ হতে হয়। রাণীকে দেখলে, মনে হয় না যে তিনি রাণী। এত সাধারণ তিনি জীবন-যাপন করেন। কিন্তু শিশু মন সহজে হতাশ হবার নয়। তার ধারণা সবার সামনে রাণী ছদ্মবেশে থাকেন। সেই ছদ্মবেশ খুলে গেলেই রাণীর আসল স্বরূপ প্রকাশ পাবে। কিন্তু সেই শুভক্ষণটা তার জীবনে কখনো আসেনি।

সেই শিশু আজ পরিণত বয়স্ক। আজ সে রাণীর প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করতে পেরেছে। অল্প বয়সে তার যে রূপ দেখেছিল, সেটাই আসলে তার প্রকৃত স্বরূপ। ছদ্মবেশ-টেশ কিছু না। বাইরে থেকে তাকে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী বলে জানলেও আসলে নিঃসন্তান বালবিধবা সেই নারীর জীবনে আর কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো অধিকার ছিল না।

সেই শিশু থেকে পরিণত বয়স্ক মানুষটির ঘরে আজ রাণীর স্বরূপ তার কাছে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

◇◇◇◇◇◇◇

স্বাধীনতার স্বাদ

রীতা চক্রবর্তী (লিপি)

গতকাল রাতে মোবাইলে এলার্ম সেট করে ঘুমোতে গেল রাই। কিন্তু কেন জানি আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনে খুব ভোরে এলার্ম বাজার আগেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। ভেতরের উত্তেজনা ওকে তড়িঘড়ি জাগিয়ে দিলো হয়তো। মনে মনে রাই ভাবল,আজকের এই পুণ্য লগ্নেই ভারতমাতা শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করেছিলেন। কন্টক মুক্ত করেছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের চলার পথ সেই কবেকার দিনে! ফলস্বরূপ আমরা আজ পরম নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে কালাতিপাত করছি। রাই ঘুম ভেঙে শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসছে দেশাত্মবোধক গানের কলি,'ধন ধাণ্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...'।পাড়ার ছেলেরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে আজ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এলো কী? সেখানেই দেশপ্রেমের গান বাজছে হয়তো।

ঘুম ভাঙলেও রাইয়ের একদম বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না আজ। কিন্তু এবারে উঠে পড়তে হবে ওকে। কারণ, বারান্দার খাঁচায় বন্দী দুটো পাখি আছে ওদের,হয়তো ওদের দানা ফুরিয়ে গেছে তাই বড্ড কিচিরমিচির করে উপস্থিতির জানান দিয়ে যাচ্ছে পাখিগুলো। বরাবরই রাই ভোরে উঠে পাখিগুলোকে নিজের হাতে দানা নিয়ে খাওয়ায় আর কিছু সময় ওদের কিচিরমিচির করা বার্তালাপ শুনে। বহুদিন থেকে পাখিগুলো ওদের বাড়িতে থাকাতে ওদের সঙ্গে রাই-এর এক গভীর সখ্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পাখিদুটো ওর অবসর সময়ের প্রিয় সঙ্গী। সময় পেলেই বারান্দায় বসে ওদের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে ঝগড়া খুনসুটি দারুণ উপভোগ করে ও। আজ রাই পাখিগুলোকে খাবার খাইয়ে বারান্দার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালো। ক'টা কচিকাঁচা হাতে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ নিয়ে মুখে ' 'জয়হিন্দ' বন্দেমাতরম বলে বলে এগিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। ওদের চোখে মুখে লেগে আছে উচ্ছল আনন্দ। আহারে ওরা তো জানে না ,আজকের এই শুভ দিনটি প্রাপ্তির অতীত কাহিনী! মনে মনে ভাবল ,যতদিন না বুঝে,ততদিনই ভালো। রাই দেখল,আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে।ভোর রাতেতো প্রচুর বৃষ্টি হলো, তবুও আকাশ কাঁদছে কেনো!! তবেকী ১৯৪৭-এর পূর্বের পরাধীন ভারতের অতীত ইতিহাসের কথা ভেবে প্রকৃতি কাঁদছে! রাই-এরও ভীষণ কান্না পেল এবার, মনে পড়ে গেলো পরাধীন ভারতের অতীত ইতিহাস,আর এতে ইন্ধন যোগাচ্ছে সেদিনের আন্দামান ভ্রমণের সুখস্মৃতি। রাইয়ের জীবনে এবারের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসটি একটু বিশেষ মাত্রা নিয়ে এলো যেন। কারণও অবশ্যই আছে, এবার স্বাধীনতা দিবসটিকে বিশেষ ভাবে দেখার জন্য। এইতো সেদিন,ওরা সবাই মিলে হইহই করে বেরিয়ে পড়ল স্বাধীন ভারতের তীর্থ ভূমি সেলুলার জেল দেখতে। আর সেই থেকেই রাই এই দিনটিকে নিজের মনের গভীরে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে নিলো নিজের বোধশক্তি দিয়ে। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো পরাধীনতার আস্ফালন।

ভাবছিল সেদিনের কথা, সেদিন যখন সেলুলার জেলের বাইরে প্রদর্শনী ঘরে ঢুকে ছবিগুলোর নীচে স্বদেশীদের জীবন গাঁথা পড়ছিল ,তখন বারেবারেই দুচোখে জল উপচে পড়ছিল ওর। প্রদর্শনী ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা ধীর পায়ে সেলুলার জেলের ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখের সামনে বিশাল আকারের কারাগারটির তিনটে উইং চোখে পড়ল। অতীতে সাতটি উইং ছিল, কালের গর্ভে চারটি উইং ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনটি উইং আজও সবরকম ঝড় -ঝাপটা সহ্য করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।উইং-এর ভেতরে রাজবন্দীদের থাকার জন্য আলো বাতাস হীন অন্ধকার কুঠুরিগুলো দেখে দুঃখে ব্যথায় রাই কেঁদেই ফেললো। ছ'শ কয়েদির দিনরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই সেলুলার জেল। সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা জোর করেই কয়েদিদের দিয়ে নিজের কবর নিজেকেই খুঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেছিলো সেদিন। কাজ করতে না চাইলে কয়েদিদের ভাগ্যে জুটতো চরম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এই সেলুলার জেলটির কথা ও ছোটবেলা থেকেই ইতিহাস বই ও নানা বই-পত্রে পড়ে এসেছে,এমনকি ওর এক দাদু ছিলেন স্বদেশীদের দলের লোক আর তিনি ওই কালাপানিতে ছ'মাস বন্দী হয়েও ছিলেন ,একথা রাই ওর মায়ের মুখে শুনেছিল ছোটবেলায় । তবে তখনতো ও অনেকটাই ছোট তাই মায়ের কথাটির খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি ও, এখন ওর খুব কষ্ট হয়, ইস!! মায়ের থেকে যদি দাদুর জীবনী আরো একটু ভালোভাবে জেনে নিতো রাই তবে কী ভালোই না হতো!! 'স্বাধীনতা' কথাটির অর্থ বোঝার মতো বোধবুদ্ধি হয়নি তখন ওর। কত ত্যাগ,তিতিক্ষা,ধৈর্য ও আত্মবলিদানের ফল হলো আমাদের আজকের এই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষ!কত কত মায়ের বুক খালি করে, কত কত বোনের ভাইফোঁটা রক্ষাবন্ধনের সুখটুকু কেড়ে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল সেদিন, সেগুলো রাই অনেক বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে। আর যখন বুঝতে পারল তখন থেকেই মনে মনে দু'চোখে একটি স্বপ্ন সাজিয়ে নিল রাই, জীবনে একবার সেলুলার জেলের মাটিতে দাঁড়িয়ে একটি প্রণাম করে আসবে ও।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এইতো সেদিন ওর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেলো। সেলুলার জেলের মাটিতে অক্ষয় মশালের সামনে সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম সারলো রাই।গাইডের মুখে শুনলো কালাপানি জেলের করুন ইতিহাস।শুনতে শুনতে রাই-এর কখনো দুচোখ ছাপিয়ে জল উপচে পড়ছিল, কখনো আবার স্বদেশী ভাইদের নির্ভীক বীরত্বের কথা শুনে গর্বে বুকটা ভরে উঠছিল। যারা ফাঁসির মঞ্চে বন্দে মাতরম স্লোগান দিতে দিতে হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নেয় তাঁদের জন্য গর্ব বোধ হয় বৈকি। তাঁদের এই আত্মবলিদানের ফসল আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষ। যদিও কিছু স্বার্থান্বেষী কূটচক্রী লোকের ক্রুর স্বার্থপরতার জন্য অখণ্ড ভারতবর্ষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তবে আন্দামানের বীর শহীদদের বীরত্বের গাঁথা শুনে এতটুকু বুঝতে পেরেছিল ও, আমাদের দেশের স্বাধীনতা এসেছে নেতাজি,বীর সাভারকার ও তাদের অনুগামীদের হাত ধরে। যাঁরা একগালে চড় খেয়ে আরেকটি গাল পেতে দিয়েছিল সেই ভণ্ড রাজনীতিবিদরা মূলত দেশর ক্ষতি সাধন করে দেশকে টুকরো টুকরো করে রেখে গেছে,দেশের স্বাধীনতায় বলতে গেলে তাঁদের কোনো অবদান নেই আর রাই-এর কাছে। নেতাজীর সেই অমোঘ বাণী,' তোমরা আমাকে রক্ত দাও ,আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো'কথাটিই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল সত্য। এমনি সব এলোমেলো ভাবনার মাঝে শুনতে পেল, পাড়ার ক্লাব থেকে ভেসে আসছে ' মুক্তির মন্দির সোপান তলে/কত প্রাণ হলো বলিদান/ লেখা আছে অশ্রু জলে.... রাই ভাবলো, সত্যি তো! কত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে আজ ভারতবাসী বন্ধন মুক্ত হয়েছে! কত লাশ গুম করে সাগর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সঠিক হিসাব হয়তো আজও কেউ জানে না।

মাইকে জানান দিচ্ছে, সকাল ৮-টাতে পতাকা উত্তোলন হবে, পাড়ার সকলে যেন অনুষ্ঠান স্থলে সময়ের পূর্বেই উপস্থিত হয়ে যান। শুনে রাইও রেডী হতে ঘরে ফিরে এলো। দাঁত ব্রাশ করতে করতে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই পাখিগুলোর দিকে চোখ পড়ল রাই-এর। আহারে তোরাওতো বন্দি জীবন কাটাচ্ছিস কতদিন ধরে! রাই মনে মনে ভাবল ,নিজের সামান্য আনন্দের জন্য একী করছে ও! পাখিগুলোর আকাশে উড়ার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ও নিজেওতো পাশবিক মনেরই পরিচয় দিচ্ছে! ওরাতো মুক্ত,খোলা আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণ ওদের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া,তবে কেন ও পাখিগুলোকে খাঁচায় বন্দি করে আনন্দ উপভোগ করছে! আর নয়,যা আজ থেকে তোরা মুক্ত,বলেই রাই গিয়ে খাঁচার দরজাটি খুলে দিল। নিমিষেই ওর প্রিয় পাখিগুলো বন্দিদশা কাটিয়ে খোলা আকাশের বুকে কিচির মিচির করতে করতে দূর আকাশের গায় ডানা মেলে দিল। রাই পরম তৃপ্তিতে অবাক চোখে আকাশের বুকে চোখ মেলে রইল। দেখলো পরম আনন্দে পাখিগুলো দূরে ,আরও দূরে উড়ে চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওরা দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। আজ রাই পাখি গুলোকে আকাশে উড়ার স্বাধীনতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো স্বাধীনতার স্বাদ।

এবারে রাই ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি রেডী হতে লাগল,পাড়ার ক্লাবে পতাকা উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত গাইতে হবে যে!

<><><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

লালা পুলিশ স্টেশন

সর্বাবস্থায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

ট্রাফিক আইন মেনে চলুন।

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ ও শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -

লালহিলমসাং পল
ওসি, লালা থানা

উপেক্ষিতা উর্মিলা
মৃণালিনী দেবী

রাজ অট্টালিকার অন্তঃপুরের
নিরব নির্জন কোঠায় বসে
কে তুমি পতিব্রতা নারী,
সয়েছিলে নীরবে
বিচ্ছেদের বিরহ বেদনা।

তোমার দুগালে উপচে পড়েছিল
ভরা যৌবন আর প্রেম বিরহের
দু-ধারা অশ্রু
যেন বন্যা ভরা বর্ষার।

ধিকি-ধিকি জ্বলছিল মনের গহনে
শোকের দাবানল স্বামী বিচ্ছেদের,
তবুও তুমি হওনি বিহ্বল
রেখেছ কুলের সম্মান, মর্যাদা।

নব পরিণীতা সুন্দরী রাজবধু তুমি
প্রখ্যাত কোনো রাজকুলের
সতী সাধ্বী মহিয়সী নারী।
স্বামীর অপেক্ষায় কাটে চৌদ্দবছর
নিঃসঙ্গ নীরবে ছিলে তুমি।

নির্মল দাম্পত্য প্রেম,
নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও কর্তব্যবোধের
যেন একগাছি জ্বলন্ত সলতে তুমি,
বিধির বিধান, নিয়তির পরিহাস
হতে পার তুমি কাব্যে উপেক্ষিতা
তবুও তুমি যে প্রণম্য আমাদের।
তোমার পরিচয় না-থাকতে পারে।
হতে পারে তা কী মহাকাব্য রামায়ণ ?
যুগে যুগে থাকবে তুমি
স্মরণীয় অতীত হয়ে
তুমি রমণী অনুপম,
উপেক্ষিতা উর্মিলা সতী।
হতে পারো তুমি উপেক্ষিতা
তবু থাকবে তোমার খ্যাতি
হবে যুগজয়ী।
আবারও জানাই শত সহস্র প্রণাম
তোমাকে আমার।

অনুবাদক ঃ নিশুতি মজুমদার

<><><><><>

ঘুমটা যখন ভাঙ্গে
এম রিয়াজুল আজহার লস্কর

সমুদ্রে ঢেউ হচ্ছে তুফান আকাশ কালো গোটা,
ছাঁদ যে ফুটো পড়ছে মাথায় বৃষ্টি ফোটা ফোটা।
ঝড় তুফানে জাহাজ আমার ছুটছে নেচে নেচে,
ডুবছে উঠছে তুলছে মাথা যাত্রী যাচ্ছে বেঁচে।

চতুর্দিকেই শব্দ জলের তিমি মাছের খেলা,
দ্বীপের মধ্যে ডাকছে পাখি গভীর রাত্রি বেলা।
দ্বীপের মধ্যে হরেক রকম প্রাণী শুধু গরজায়,
অজগরটা আসছে তেড়ে জাহাজের মূল দরজায়।

অন্ধকারে ডুবল জাহাজ শঙ্কার বইছে হাওয়া,
আশমানে যে চন্দ্র তারা যায়নি খোঁজে পাওয়া।
সমুদ্রটা পাড়ি দিয়ে চলে এলাম গাঙ্গে,
দৃশ্য এসব দেখতে দেখতে ঘুমটা যখন ভাঙ্গে,
বুঝতে পারি স্বপ্ন এটা ঠিক নরকের মত,
খারাপ ভুতে স্বপ্ন দেখায় খারাপ স্বপ্ন যত।

<><><><><>

আভয়াময়ী মা
নীহার রঞ্জন পুরকায়স্থ

শরতে এসেছো মাগো
এই ধরা মাঝে ;
প্রভাত শিশিরে মাগো --
মেঘমালা সাজে !

কাশফুলের উলসিত হাসি
পুষ্প গন্ধে শুনি, মনবেশি ;
দানিতে অভয় শান্তি --
শুভ ধ্বনি বাজে !

মর্তে এলে, ধরে কত সুখ,
ভয় নাশি, ভরে উঠে বুক,
অভয় শান্তিময়ী, মাগো --
মঙ্গলময়ী, মঙ্গলা সাজে !!

<><><><><>

জীবন জাহাজ
অমিত রঞ্জন দাস

আমার আপনজনরা বলেন
তুমি কত সুখী-
টেনশনের লেশ নেই চোখে মুখে।
আমি বলি
ক্যাপ্টেন জানে তার জাহাজখানি
কিভাবে চলছে অথৈ সাগরে।

<><><><><>

সংযম
বিশ্বজিত নাগ

নিভৃতে ঘটে চলে নিরন্তর সময়ের পালাবদল
অহং ইর্ষা সর্বত্র স্বপ্নের উত্তরণের অন্তরায়,
আসে না ফিরে উপেক্ষিত প্রতীক্ষার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
সবাই সুযোগ খোঁজে আঁধারের পথে আলোছায়ার।
পাখি উড়ে চলে নির্দ্বিধায় দূর নীল দিগন্তে
ডানায় ভর করে দেয় উড়ান আত্মবিশ্বাসী মনের জোরে,
ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ফিরে আসে কুলায় দিনের শেষে,
বাঁচার তাগিদে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে যাবতীয়
প্রতিবন্ধকতা........

আত্মতুষ্টি আর অহমিকার বেড়াজালে ব্যস্ত
সোনার তরী বয়ে চলে মাস্তুল বিহীন আপন খেয়ালে
সুসময়ে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে চোখে ঠুলি এঁটে
কর্মফলই শুধু জীবন গড়ে অনুতাপ হীন ।

নিজের উপরই থাকে সংযমের বলিষ্ঠ অংকুশ
স্পর্ধার সীমারেখায় দৃঢ় হোক নিয়ন্ত্রণ,
সরলরৈখিক জীবন বয়ে চলুক আপন ছন্দে
সোপান ছুঁয়ে ঠিক ছোঁবে উৎকর্ষের শীর্ষবিন্দু.

<><><><><>

ধর্ম ধর্ম ধর্ম

ড° অভিজিৎ মিত্র

ধর্ম আসলে বাঁচতে শিখায়,
বাসতে শিখায় ভালো,
অজানা স্বার্থে লড়তে শিখায়
মনটা যাদের কালো ।

লড়ছে যারা ধর্ম নিয়ে,
হিংসা দ্বেষেই বাঁচে,
তালিকায় শুধু মূর্খরা নয়,
শিক্ষিতরাও আছে ।

যারা ধর্ম ধর্ম ধর্ম বলে
হিংসার সীমা ছাড়ালো,
আজ কর্ম ছেড়ে বর্ম পরে
অস্ত্র ধরেছে ধারালো ।

তারা স্বর্গ খুঁজে ধ্বংসকাজে,
জীবে ঈশ্বর খুঁজে না ।
মূর্খ অন্ধ ধর্মপন্থী,
ধর্মবাণীই বুঝে না ।

তারা যতই করে আরোহন
পুস্তিকা-পুথি -পাহাড়ে,
গ্রন্থ হাজার চিবিয়ে গিলেও
যুক্তি বুঝে না আহা রে!

মহীয়ান গুণী জ্ঞানী পুরুষ
ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন,
শান্তির ছবি ছাপার তরে
নিয়ম-নকশা এঁকেছেন ।

ধর্ম বাঁচার জীবনশৈলী,
লক্ষ্য দেশের শান্তি ।
মানবিকতার বার্তা শিখায়,
অধিকার আদায়ে ক্রান্তি ।

ধর্ম বলে অস্ত্র ধরুক
যোগ্য শাসক যুদ্ধা,
জঙ্গীর হাতে মারণাস্ত্র,
দেশ বিদেশের মুদ্দা ।

ধর্ম মানে বুঝতে শিখা
ভালোবাসার মর্ম ।
ধর্ম মানে সামাজিকতা,
শান্তিই সারমর্ম ।

<><><><><>

শিউলিছোপা মেয়েবেলা

মীনাক্ষী চক্রবর্তী সোম

মনে পড়ে, সে একজনমে কাটানো হিরণ্ময় প্রহর
স্মৃতির কুয়াশা ছাপিয়ে এখনো অমলিন ভাস্বর।
শিশিরসিক্ত ভোরে জলছাপ কিশোরীবেলার
আকাশের নীল সামিয়ানায় রঙিন ঘুড়ির বাহার
হৃদয়ের কলোচ্ছাস শব্দহীন তরঙ্গে
গোপন কথার বর্মীবাক্স শরৎ শোভাতে
শিউলির সৌরভ চুপকথা আঁকে মনপাতায়
শেষের রূপকথা উঁকি দেয় রাঙা আভায়
হাজার অবন্ধনের ঘেরাটোপ চারপাশে
পায়ের পায়েল নিক্কণ শোনায় মনাকাশে
তবু ভীড় করে মন জানালায়
হিম ছড়ানো সকালবেলায়
শিউলি ভরা সাজির সাথে
আড় চোখে অঞ্জলি হাতে
ঘুম জাগানিয়া মহালয়া আর অষ্টমী নবমী
থেকে থেকে ছলকে ওঠা চকিত চাহনি
নির্ভার নির্মেদ মদির নেশার ভালোবাসা খেলা
নীরব মিছিলে হাঁটে শিউলিছোপা মেয়েবেলা।।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -

বিনতা সিনহা
সভানেত্রী
মহিলা শক্তি জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন
হাইলাকান্দি জেলা ও
সভানেত্রী, শিশু সদন এম ই স্কুল এস এম সি, হাইলাকান্দি

এ কোন মহারাজা

মহারাজা নীহার রঞ্জন দেবনাথ

মহারাজার কাটছে জীবন দেশ বিদেশে ঘুরে ,
মানবতার জয়গান গেয়ে চলছে জীবন লড়ে ।
ঘরের চালা রয়েছে ফাঁকা পড়ে বৃষ্টির জল ,
দেশবিদেশে মহারাজা উপাধি পেয়ে জীবনটা সফল ।
ঐক্য শান্তি সংহতির বাণী নিয়ে ছুটছে দিগ্বিদিক ,
তবুও মহারাজার শত্রু ঘিরে আছে চারিদিক !
মন্দির মসজিদ গীর্জায় প্রার্থনা করে সে'তো রোজ ,
তা'ইতো সবাই ভালোবেসে নিচ্ছে মহারাজার খুঁজ ।

মহারাজার সামনে এলো নতুন একটা পথ ,
ধন সম্পদের ধার ধারেনা জীবনটাই তার সৎ ।

ব্যাংক একাউন্টে নাই যে টাকা তবুও ভাসে সুখে ,
ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদে কাঁদে সদাই দুঃখে ।
ভাবনাতে রাত কেটে যায় ঘুম নেই চোখে তার,
সাম্রাজ্যবাদের পতন হোক, সুখী হোক জীবন সবার ।
পাহাড়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে , দিতে চায় বহু দেশে পাড়ি ,
বিশ্ব মানবপ্রেমের বার্তা নিয়ে ছাড়লো নিজের বাড়ি ।
অট্টালিকা দালান প্রাসাদ কিছুই রাজার নাই ,
সাধুর মত মনটি তার এমন রাজা কোথায় পাই ?
টাকা ছাড়াই ভরছে জীবন সততা মূলধন করে ,
স্বপ্ন পূরণ হবেই রাজার কে আটকায় তা'রে ?
বঁধুর সঙ্গে বাক বিতণ্ডার কাটে কিছু দিন ,
মধুর সুরে আপন করে নেয় , নিমেষেই সব হয় লীন ।
মনের সুখের এমন মহারাজাধিরাজ আছে আর ক'জন?
ভালোবাসার খেলায় সাম্যের বাণে সকলই তাঁর আপন ।

◇◇◇◇◇◇

সিংলা থেকে মহাবাহু

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

সিংলা দেখেছি আমি, একদিন বিমূঢ় বিস্ময়ে
অন্তরে ধুকপুক প্রথম প্রেমের, এই কি নদী ?
ঝাড়পথে কুলু কুলু, এত জল, এ স্রোতধারা
কোথা হতে কোথা যায় আমি বাকহারা ।

এরপর একদিন ধলেশ্বরী তীরে তীরে
হেঁটেছি আনমনে ছুটন্ত বলাকার সাথে
জুড়িয়েছি চোখ, দৃষ্টি নিবিদ্ধ দূর পারে
যেমন চলেছি সযতনে, মায়ের হাতটি ধরে ।

বরাক দেখেছি আমি উদ্ভাসিত স্ফীতচোখে
মাঝনদী ভরাজল মাঝিদের বৈঠা ও নাও
ভেঙে চুরে গেছে সব বেহিসেবি কল্পনা ফানুস
এপারে একা আমি, ওপারে পিঁপড়ে মানুষ ।

সেই আমি একদিন পড়েছি বহুধারা প্রেমে
কুশিয়ারা, মনু থেকে রাঙানদী, দিহিং-এর পাড়ে
কত কথা মহানদী, যমুনা ও বিপাশার সাথে
গঙ্গা, পদ্মা হয়ে কপিলী ও ধানশিরি পথে ।

'সিংলা পাড়ের ছেলে' থিতু হতে শেষমেশ
এ কোন দোসর এল যাপন বেলার শেষে
ভালোবেসে একটুকু দিয়েছে ঠাঁই, বাড়ায়ে দু'বাহু
কল্পনা অগোচরে থাকা মগ্ন মৌন মহাবাহু ।

◇◇◇◇◇◇

সভ্যতার ভগ্ন স্তূপ

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"ভালো আছি" শব্দদ্বয়,
আগমার্কা সত্যি নয়!
তবু বলি , "আমরা আ ছি ভালো"
অন্ধকারেই খুঁজে যাই আলো" ।।

মাঝে মাঝে ভালোবেসে বিজলীর চমক,
শ্রাবণ এখনো আসে মাটি ভালোবেসে,
এখনো আকাশ তার, করে মুখ ভার --
তবু মেঘ তো তেমন করে, প্রাণখুলে হেসে,
খোলে না যে বৃষ্টির, বন্ধ দুয়ার ।।

স্বপ্ন আজও দেখি, রাত জাগরণে,
প্রাপ্তির অপূর্ণতায় আশা -বীজ বুনে--
ভোর থেকে এমনি চলা,দিগন্ত পানে--
দু পায়ে পরে বেড়ী, ক্লান্ত যাপনে ।।

প্রশ্ন, "কেমন আছি"! ওঠে বারবার,
ঘিরে যদি না থাকে, আলো- অন্ধকার!
জীবন থেমে যাবে, হলে পূর্ণ ডালি-
কিছু থাক অ- ধরা, হাত কিছু খালি ।।

অনাচার সয়ে দীর্ঘদিন আজ আগ্নেয়গিরি
আমার অন্তর ভেদ করে রক্ত লাল লাভা
বেরিয়ে আসে, পুড়ে খাক হয়ে যায়
নান্দনিক যত কিছু ঘিরে রেখেছিল মোদের
সহস্র বছরেও মুছে যাবে কি সেই দাগ!
উত্তর দেবে ভাবীকাল, সভ্যতার ভগ্নস্তূপ থেকে ।।

◇◇◇◇◇◇

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
কামনা করি, পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক।

ডাঃ সুব্রত দে
ইনচার্জ, কাটলিছড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

সমন্বয় তলানিতে

নজরুল ইসলাম বড়ভূইয়া

আজ আর নেই আগের উন্মাদনা
হারিয়ে গেছে কালের স্রোতে ,
গুরু শিষ্য সমন্বয় আজ তলানিতে
বিনয় ভক্তি শ্রদ্ধাবোধ লুপ্তি পথে।

আগের দিনে দুষ্টামিতে নহে
পঠনপাঠনে ছিল বেত্রাবরণ,
যেন মায়ের স্নেহ মাখা শাসন
শিষ্য জড়িয়ে ধরে গুরুর চরণ।

আজও আছে সে শিক্ষাঙ্গন
আছে আনাগোনা ছাত্রধারা,
গুরু শিষ্যে কি যেন ফারাক
হারিয়ে গেছে ভাব পরম্পরা।

বেত্রাঘাত ? মানে না বারণ
আজিকালি মানা যে শাসন,
তিল থেকে তাল নালিশ রুজু
মা বাবা তেড়ে,ডাকে প্রশাসন,

পড়া শোনায় উদাস মন
বেলেল্লাপনায় মত্ত,
চুপিসারে ফটো আঁটে
বিড়ম্বনা, প্রকাশে তথ্য।

না মানে কারণ বারণ
বাক বিতণ্ডায় জড়ে ,
সাদাসাদে গুরু হলে
যত দোষ চেপে ঘাড়ে ।

কিছু লাজুক কিছু আদর্শ স্বভাবে
আমতা আমতা করে ওদের প্রভাবে,
আজিকালি বিদ্যাঙ্গনে অহরহ যা ঘটে
সেকালের সেই সতন্ত্র শাসন অভাবে ।

যারা ছিল আরুণী চরিত্রে
ওরাই প্রতিষ্ঠিত স্বীয় কর্মে,
আজও প্রনাম ভরে নত শিরে
ছাত্র ধারা স্মৃতিতে মর্মে মর্মে।

◇◇◇◇◇◇

শ্রাবণের রাতে

দেবব্রত মাজী

সময়টা ঠিক ছিল শ্রাবণের রাত,
বেরিয়েছে রাস্তায় শেয়াল সাত।
ঝরেই চলেছে শ্রাবণের বারিধারা,
শেয়ালেরা মনে হলো দিশাহারা।
সর্বদিকে তখন অন্ধকারে কালো,
পড়লো চোখে হঠাৎ করে আলো।
তখন ঘুমিয়ে পাড়া ডাকিয়ে নাক,
আকাশ বিদীর্ণ করে এলো ডাক।
পাড়ায় এক আলোড়ন যেন এলো,
চতুর্দিকে কোলাহল মুখরিত হলো।
নিশুতি রাতে দেখিনি এমন দৃশ্য,
মুহূর্তে শেয়ালগুলো হলো অদৃশ্য।
ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো সব পরিবার,
নও জওয়ানেরা নাহে ছাড়িবার।
পড়লো বেরিয়ে সব লাঠি হাতে,
এক শেয়াল ছিল লুকিয়ে খাতে।
পড়লো রাগ শেয়ালের উপরে,
তাকে মেরে ঘোরালো নগরে।
ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে অনবরত,
শেয়ালটি মনে হল বহিরাগত।
শ্রাবণের বারিধারা যেন ফল্গুধারা,
বইছে কলকল শব্দে নদীর ধারা।

◇◇◇◇◇◇

বরাক বাংলা

সঞ্জয় দাস

ঐতিহাসিক কাল থেকে বরাকে নিবাস,
বাঙালি মহান জাতীর তাহাদের বাস।
বরাক নদীর তীরে এই সুন্দর স্থান,
বহু লোক দিয়ে গেলেন বাংলার প্রমাণ ।
কতো শত বাঙ্গালী আছেন এই স্থানে,
তাহাদের জন্মভূমি কাছাড় বরাকে।
প্রিয় এই মাতৃভূমি প্রিয় এই ভাষা,
আমাদের বাঙ্গালির গর্বের কথা।
স্বাধীন ভারতের পরবর্তী সময় কালে,
উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের আগ্রাসনে।
বরাকের ভাষা সংস্কৃতি লুপ্ত করতে,
অপশক্তি চালিয়ে ছিল বরাকে অভ্যন্তরে।
নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষাতে,
আত্মা বলিদান করে একাদশ শহীদে।
বরাকের সুযোগ্য সন্তানের দলে,
আত্মবলিদান দিলেন বরাকের কুলে।
বাংলা মায়ের ভাষা, মাতৃ সমতুল্য,
বাঙ্গালির জীবনধারা এই প্রকাশিত।
বরাক নদী আর বাংলা ভাষা,
অটুট বন্ধন বাধিয়াছে তাঁরা।
বরাক ভুমিও বাঙ্গালির জাতি,
প্রাকৃতিক বন্ধনে আছে এক স্মৃতি।

◇◇◇◇◇◇

দেবদাস

দিলুয়ার হুসেইন শুভ

বুক পাঁজরে রেখেছিলাম তোমায় অসীম যতনে
শূন্য করে চলে গেলে, মতি কাঁদে গোপনে।
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন ছিল হবো প্রেমিক চণ্ডীদাস
পথের বাঁকে হারিয়ে গিয়ে, করলে দেবদাস
সপ্তসাগর ঘুরে ঘুরে তোমায় খুঁজি হয়ে হতাশ
রজকিনী; তব স্পর্শ পেলে হতাম বনবাস।
নিশীথ পথে আজও খুঁজি যদি আসতে স্বপনে
মতি বলে বিচ্ছেদ জ্বালা সহিতে হয় গোপনে
উড়তে দি'ছিলাম তারে শিকল মুক্ত করে
কার পিঞ্জরে করছে বসত! আমায় শূন্য করে
প্রিয়জন হারালে বুঝতে নিষ্ঠুর হৃদয়ে আসে কত শোক
বিনয় করি হে বিধি, ধরায় কারো বিচ্ছেদ নাহি হোক।

◇◇◇◇◇◇

ফোন করেনি ঈশ্বরী

জিতেন্দ্র নাথ

ফোন করেনি ঈশ্বরী , করবে বলেছিল
প্রহর গুনছি কখন বর্ষন হবে
আমি অপেক্ষারত চাতক পাখি
আসলে অপেক্ষার সময় দীর্ঘ থেকে
দীর্ঘতর হয়

তার সাড়া পাচ্ছি না ইদানিং
পাতার আড়ালে বোধহয় কিংবা
ব্যস্ততার জালে আটকা পড়ে গেছে

তার ফোন পেলে
আমার হৃদয় জুড়ে বৃষ্টি ঝরে
আমি আবার দাঁড়াই আকাশ ছুঁতে
তার সৃজনশীলতা মুগ্ধ করে

ছাদ

বিকাশ বসাক

বৃষ্টিতে ভিজতে চাইছিলাম
তপ্ত দেহ মেঘ থেকে নেমে আসা বিন্দু বিন্দু জলধারায়
শরীরটা শান্ত হবে
বৃষ্টি ভেজা কাপড়ে দেহমন প্রফুল্ল হবে।
ছাদে দাঁড়িয়ে মৃদু বায়ুতে কত রাত পেরিয়ে গেছে --
দুজনের দাম্পত্য কথার পরিসর......
কত স্মৃতি রয়ে গেছে ছাদে ছাদে।
সুখ দুঃখ, অভাব অনটন আনন্দ বিষাদ সব শুনতো
খোলা আকাশ প্রবাহিত বায়ু ভূমন্ডলের ছাদ...
আনন্দ দিত মিটমিটে তারা জ্যোৎস্নার চাঁদ উড়ে যাওয়া
সাদা কালো ধূসর মেঘ নীল আকাশ......
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম একা অথবা দুজনে নিরবে
অথবা কথোপকথনে সময়ের
পরম্পরায় স্মৃতি মন্থনে......
ছন্দপতনে একা জীবন --
পারস্পরিক আলোচনার জৈবিক ছাদ স্বর্গে গেছে
সময় ও গতি পথে চলছে, ঘরের ছাদ নিশ্চুপ.......
ভূমন্ডলের ছাদ চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ......
প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে!! ....

<><><><><>

জীবন-যন্ত্রণা

মীনা কুমারী দেবী

জীবনের কতো না বলা কথা,
হৃদয় আকাশ ছাড়িয়ে হাঁটে,
বলা হয় না --মুখেই থাকে ;
হৃদয়ের আঙ্গিনা--চৌচির ফেটে---

জীবনে অনেক কিছুই পাই,
আবার অনেক কিছু হারাই,
কিন্তু চলার পথে চলতে হয় ;
কিছু পাই বা না পাই ----

জন্মিলে ভাবি যে সুখ পাবো,
ভাবতে থাকি এক হয় অন্য,
কিন্তু চলার পথে চলতে হয় ;
করতে হয় না কিছু গণ্য---

জীবন যাতনা--মায়া মোহের ঘর,
তাতে অনেক না বলা যন্ত্রণা,
হৃদয়ে ধারণ করে মানুষ ;
আবার বুনে মোহের কল্পনা ---

একদিন ছেড়ে যাবো এ ধরনী,
রবে না অবশিষ্ট কোন মায়া,
ছাড়বো আশা-নিরাশা-মোহ ;
ছেড়ে চলে যাবো এ কায়া ---

<><><><>

ইতিহাস

আলি আমজদের ঘড়ি

সিলেটের পরিচিতি, ইতিহাস গৌরব ও সম্প্রীতি

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

পৃথিবীটাই একটা ভ্রমণের জায়গা। এ পৃথিবীর সবখানে ছড়িয়ে আছে মানুষের দেখার ও গ্রহণ করার অনেক কিছু। বিশ্বের সব দেশের আলাদা সমাজ-সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য রয়েছে। মানুষ তো প্রতিদিন ভ্রমণ করছে, আর দেখে চলছে সাজানো পৃথিবীকে। দুনিয়ার অসংখ্য দেশের মধ্যে আমাদের দেশও অনেক সুন্দর, অনেক রূপসী। সমগ্র বাংলাদেশ যেন একটি ফুল–যার অনেক পাপড়ি, প্রতিটি পাপড়িতে একেক ধরনের সৌন্দর্য। বাংলাদেশের সৌন্দর্য যত দেখা যায় ততই ভালো লাগে তবু যেন তৃপ্তি মেটে না। আমাদের দেশের নদীনালা, খালবিল, পাহাড়টিলা নানা ধরনের গাছ ও প্রকৃতি জীবনভর দেখেও যেন তৃপ্তি হয় না। বাংলাদেশকে ভ্রমণের ফুল ভাবলে সিলেট হচ্ছে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পাপড়ি। যাকে না-দেখলে বাংলাদেশকে দেখা হবে না। যাকে না-দেখলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় থেকে যায় বিরাট এক অভাব। এ অভাবকে পূরণ করতে সিলেটকে ঘুরে দেখা অবশ্যই জরুরি।

ভৌগলিক অবস্থান

ছিলট, সিলেট, শ্রীহট্ট, সিলহট, জালালাবাদ বর্তমানে সিলেট বিভাগ নামে পরিচিত এ ভূখণ্ডটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। আয়তন : ১২,৫৯৬ বর্গকিলোমিটার (৪,৯১২ বর্গমাইল)। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে বর্তমানে ভারতের করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানাসহ সাবেক সিলেটের আয়তন ছিল ৫,৪৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পরিমাণ অনুযায়ী ৭১,৪৭,০০০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৫৯৭ জন। ২০01 খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারি অনুযায়ী সিলেট বিভাগের মোট জনসংখ্যা ৭৮,৯৯,৮১৬ জন। তন্মধ্যে পুরষ ৩৯,৮৭,৩৬৯ জন এবং মহিলা ৩৯,১২,৪৪৭ জন। সেক্স রেসিও ১০১.৯। সিলেট বিভাগ ভারতের মেঘালয় রাজ্যভুক্ত খাসিয়া জৈন্তা ও গারো পাহাড়ের দক্ষিণে। পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা। পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলা। দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। মোট উপজেলা ৩৫টি, ইউনিয়ন পরিষদ ৩২২টি, মৌজা ৫৪৮২টি, গ্রাম ১০,২২৪টি, মোট জমি ১৫,০৭,৪৭০ হেক্টর (৩৭,২৫,০০০ একর), বনাঞ্চল ৭৭,০৪৩ হেক্টর (১,৯০,২৯৬ একর), শিক্ষার হার ২৭.৮৫%, সমুদ্র সমতল হতে ভূমির উচ্চতা ১৪.৬৩ মিটার (৪৮ ফুট)। আন্তর্জাতিক ভূমণ্ডলে ২৩০৫৯-২৫০১৩ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০০৫৪-৯২০২৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে সিলেট বিভাগের অবস্থান।

ভূ-প্রকৃতি

দুটি ভূপ্রকৃতির সমন্বয়ে গঠিত সিলেট বিভাগের ভৌগলিক পরিমণ্ডল। সিলেট বিভাগের পূর্বাংশ এবং দক্ষিণাংশ মোটামুটি পাহাড়ী এলাকা। [সিলেট-মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার অংশবিশেষ] মধ্যভাগের সমভূমি থেকে শুরু হয়ে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল [সিলেট-মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের ভাটী অঞ্চল এবং সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা]। ক্রমশঃ ঢালু হয়ে বিশাল হাওরে পরিণত হয়েছে। উজানের পার্বত্য ও সমভূমির বুক চিরে প্রবাহিত সুরমা, কুশিয়ারা, খোয়াই, করাঙ্গী, মনু, ধলাই, বিজনা, বিবিয়ানা, রতড়বা, পিয়াইন, পৈন্দা, শুটকি, শাখা বরাক, সুতাং, মহাসিং, কালনী যাদুকাটা প্রভৃতি নদী উপনদী যখন বর্ষাকালে সহসা প্রবল বর্ষণে উজান অঞ্চল ধৌত করে ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল হাওরসমূহে অথৈ জলরাশি ঢেলে বা উগলে দেয়, তখন সিলেট বিভাগের সমগ্র ভাটি অঞ্চলকেই 'সায়র' বা সাগরের মতো দেখায়। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সিলেট বিভাগের উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দি পর্যন্ত সাগরতলে নিমজ্জিত ছিল। পরবর্তীকালে সাগর ভরাট হয়ে ক্রমশঃ এ জনপদে জনবসতি গড়ে উঠে।

নামকরণের ইতিবৃত্ত প্রাচীনকাল থেকে ছিলট, সিলেট, সিলহট, শ্রীহট্ট, জালালাবাদ, বিভিনড়ব নামে এ ঐতিহাসিক ভূখণ্ডটি দেশবিদেশে সুপরিচিত। জনপদ ও জমিনের নাম যুগে যুগে বদলায়। এর পেছনে কাজ করে বহুবিধ কার্যকরণ। উচ্চারণ ও ঐতিহাসিক পট পরিক্রমায়।

সিলেটের ভূতলকে বিভিন্নভাবে ইতিহাসগ্রন্থে আখ্যায়িত করা হয়েছে এভাবে :

☐ চীন দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার দাওয়াত ক্রমে কামরূপ সফর করেন ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে। তখন রাজা ভাস্কর বর্মার রাজ্য সীমা ছিল দুহাজার বর্গমাইল। ওই সময় ১. মণিপুর, ২. কাছাড়, ৩. জৈন্তা, ৪. সিলেট, ৫. ময়মনসিংহ বা

মোমেনশাহী প্রভৃতি জনপদ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানীর নাম ছিল 'প্রাগজ্যোতিষপুর।' হিউয়েন সাঙ সিলেটকে 'শি-লি-চা-ত-ল' বলে তার সফরনামায় উল্লেখ করেছেন।

☐ খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দিতে রচিত বিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক মনীষী আল বেরুনী 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে সিলেটকে 'সিলাহেত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি বর্ণমালায় 'ট' হরফ নেই। তাই 'ট' এর স্থলে 'ত' করা হয়েছে।

☐ প্রাচীন গৌড়ের রাজা 'গুহক' তার কন্যা শীলাদেবীর নামে একটি হাট স্থাপন করেন। এ কারণে 'শীলহট' থেকে সিলট বাসিলেট বলা হয়।

☐ হিন্দু পুরাণমতে সতীদেবীর হাড় বা হড্ড উপমহাদেশের ৫১টি স্থানে পতিত হয়। সতীর দুটি হাড় নাকি সিলেটেও পড়েছিল। সতীর অপর নাম 'শ্রী'। তাই 'শ্রী+ হড্ড' থেকে শ্রীহট্ট বলা হয়। লক্ষ্য করার বিষয়, সতীর বাদবাকি ৪৯টি হাড় বা হড্ড অপরাপর যে সকল স্থানে পড়েছিল ওইসব স্থানের নাম শ্রীহট্ট বলে প্রমাণ নেই। কবি জয়নাথ জয়নন্দীর ভাষায় :

যে যে স্থানে সতী অঙ্গ হৈল নিপতিত
ভূ-মধ্যেতে সেই স্থান অত্যন্ত পবিত্র।
আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গ সমান
দুটি মহাপীঠ হেথা আছে বিদ্যমান
'ফালজোরে' বাম জঙ্ঘা জৈন্তা পরগণায়
কালাগুলে গ্রীবাপীঠ আছে দেখা যায়...

হজরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক 'সিল হট্ যাহ' হুকুম থেকে 'সিলহট্' নামের উৎপত্তি বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। উল্লেখ করা আবশ্যক ইংরেজিতে সবসময় SYLHET লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সিলেট ও আসাম অঞ্চল বরাবরই শিল বা পাথরের জন্য বিখ্যাত। এ কারণেই শিলচর, শিলং, শিলঘাট, শিলাম, সিলট, শিলিগুড়ি ইত্যাদি স্থানের নামকরণ হয়েছে। মোটকথা সিলেট একটি সুপ্রাচীন ভূখণ্ডের নাম। এর ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সাধনা দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধ হলেও এর নামকরণের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ইতিহাস নেই। এ কারণে নানা মুনির নানা মত।

'ছিলটী নগরী লিপি'-তে একটি প্রাচীন বন্দনা গীতিতে সিলেটের সীমা চৌহুদ্দি এবং মাটি ও মানুষের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে :

পহেলা বন্দনা করি মালিক ছত্তার
দুছরা বন্দনা করি নবী মছ্তফার॥
পুবেতে বন্দনা করি আসামর পা'ড়
দখ্খিনে বন্দনা করি জিলা তিরপুরার॥
উত্তরে বন্দনা করি হিমালী পরবত
পছ্ছিমে বন্দনা করি ময়মনসিংহর পথ॥
তিছরা বন্দনা করি ছিলটী মানুষ
না-কিছের কথাগুলি হুন দিয়া হুশ্॥
ধন আছে জন আছে, আছে ধান চাউল
অরিণ আছে পাখী আছে, আছে মাছ হউল॥
আকল আছে বুধ্ধি আছে, আছে শান্ মান্
গলাভরা গান আছে, গোলাভরা ধান॥
কিওর লাগি গম কর আল্লা কর সার
পীর মুর্শিদ আউলিয়ার দোয়ায় অইবায় পার॥
যত নিয়মিত দিছৈন আল্লায় দুনিয়ার মাঝ
বাশ্শাগিরি করা হৈল ছিলটীর কাজ॥
আরব দেশের মাটির লগে মিল ছিলটর
এর লাগি বাস হেথা বাবা শাহজালালর॥
জালালী কৈতর উড়ে কাজল পাংখা দিয়া
আল্লা আল্লা জিকির পড়ে তারা সবে বৈয়া॥

প্রাচীন লোক কবির উল্লিখিত পঙ্ক্তিমালা আমরা যদি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বিশেষণের মাধ্যমে এর একটি রেখাচিত্র আঁকতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখা যাবে, একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা ও অধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্রীয় মরকজ, মননচর্চা ও চিৎপ্রকর্ষের উজ্জ্বল দোলনায় হিল্লোলিত ধনের দেশ, ধানের দেশ, জ্ঞানের দেশ, গানের দেশ হিসেবে রয়েছে সুপ্রাচীন সিলেট ভূমির সুনাম ও সুখ্যাতি। চিরসবুজের দেশ বলে 'শ্যামল বাংলা' অভিধাটির বাস্তব নিদর্শন প্রাচ্যসূর্য হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি'র পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত জালালাবাদে বিদ্যমান।

সিলেটের পরিচিতিতে বহুল প্রচলিত লোকগাঁথা :

চাঁদনী ঘাটের সিঁড়ি
আলী আমজাদের ঘড়ি
বঙ্ক বাবুর দাড়ি
জিতু মিয়ার বাড়ি।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট একটি প্রাচীন জনপদ। ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলির কারণে সিলেট প্রাচীনকাল থেকেই পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত। হজরত শাহজালাল (রহ.), শাহপরাণ (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত এবং শ্রীচৈতন্যসহ অগণিত সুফি সাধক ও কৃতি পুরুষের জন্মভূমি, জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী রত্নগর্ভা এই সিলেট। সুরমা-কুশিয়ারা-মনু-খোয়াই বিধৌত দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির আমাদের এই সিলেট মনোরম নিসর্গের লীলাক্ষেত্র। ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চল ব্রিটিশদের করায়ত্ত হওয়ার পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলার সৃষ্টি হয়।

সিলেট পৌরসভা সৃষ্টি হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে। সিলেটের প্রথম কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ পান মি. উইলিয়াম থ্যাকারে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন এক মারাত্মক ভূমিকম্পে সিলেট শহর

প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯১২-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটি শাখা সিলেটের সাথে সংযুক্ত হলে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সিলেটের বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত অবসান হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ও ৭ জুলাই গণভোটের মাধ্যমে সিলেট আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে সিলেটের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভিবাসন গ্রহণ করেন। তাঁরা দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং এখনও তাদের উত্তরসূরিদের দ্বারা তা অব্যাহত রয়েছে। বনজ, খনিজ ও মৎস সম্পদে ভরপুর ওলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখদের এই অঞ্চল। দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে অনেকগুলিরই অবস্থান এই অঞ্চলে। সিলেটের হরিপুরে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র এবং ওই গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। দেশের ২৮তম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের জকিগঞ্জে। দেশের প্রথম তেল ক্ষেত্রও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে যা জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে উত্তোলন শুরু হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রয়েছে সিলেটে। একসময় সিলেট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে পন্ডিতগণ অনুমান করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে সিলেটের উল্লেখ আছে। রামায়ন যুগেও সিলেট ভূমি সম্মানিত ছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সাধকদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে এই অঞ্চল। উন্নত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সৃষ্ট আভিজাত্য সিলেটবাসীকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। সিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলটি বা প্রাচীন নাগরী। ছিলটি ভাষার নিজস্ব বর্ণমালাসহ লৈখিকরূপ রয়েছে যার নাম নাগরী। ছিলটি নাগরী লিপিতে ৫টি স্বরবর্ণ ও ২৮টি ব্যঞ্জনবর্ণসহ মোট ৩৩টি বর্ণ রয়েছে।

ঐতিহাসিক নির্দশনগুলোর মধ্যে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার, হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার, শ্রীচৈতন্যদেবের বাড়ি, মণিপুরী রাজবাড়ি, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, আলি আমজাদের ঘড়ি, চাঁদনীঘাটের সিঁড়ি, জিতু মিয়ার বাড়ি, ক্বীনব্রিজ, সারদা হল, মিউজিয়াম অব রাজাস এবং সিলেট সার্কিট হাউজ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে দু'একটি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন/স্থানের বর্ণনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি–

ক্বীনব্রিজ

সিলেট শহরকে দুই ভাগ করে দিয়ে নিরন্তর ছুটে চলেছে সুরমা। দুই পাড় জোড়া দিতে সেই ইংরেজ আমলে তৈরি হয় লোহা লক্করের ক্বীনব্রিজ। ক্বীনব্রিজ সিলেটের প্রবেশদ্বার; সুরমা নদীর উপর নির্মিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আব্দুল হামিদ এবং আসামের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য বাবু প্রমোদ চন্দ্র দত্ত-এর উদ্যোগে এই ব্রিজ তৈরি হয়। ব্রিজটি উদ্বোধন করেন আসামের তৎকালীন গভর্নর মাইকেল ক্বীন (Michael Keane) এবং তার নামেই ব্রীজের নামকরণ করা হয়। স্টীলের তৈরি এই ব্রিজটি দৈর্ঘ্যে ৩৯৫ মিটার এবং প্রস্থে ৫.৫০মিটার। ব্রিজটি নির্মাণে তৎকালীন সময়ে ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৫৬ লাখ টাকা। সময়ের সাথে সাথে এর কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে সড়ক ও জনপথ বিভাগ পুনরায় ব্রিজটির মেরামত করে।

আলি আমজাদের ঘড়ি

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের সাথে একত্রীভুক্ত হয়। এই নিয়ে তখন সিলেটে তীব্র প্রতিবাদ হয়। সিলেটের জনগণকে শান্ত করার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থ ব্রুক সিলেটে সফর করেন। বড়লাটের সিলেট সফর উপলক্ষে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার পৃথিমপাশার জমিদার নবাব আলী আহমদ খাঁ সাহেব তাঁর নিজপুত্র নবাব আলি আমজাদ খাঁন-এর নামে পৃথিমপাশা স্টেটের অর্থায়নে এই ঘড়িটি নির্মাণ করেন। ঘড়িটির দৈর্ঘ্য-৯ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি; নিচ থেকে ছাদ পর্যন্ত, উচ্চতা-১৩ ফুট, ছাদ থেকে ঘড়ি অংশের উচ্চতা-৭ ফুট, ঘড়ির উপরের অংশের উচ্চতা-৬ ফুট, মোট উচ্চতা-২৬ ফুট। প্রায় ১৪৯ বছর যাবৎ উক্ত ঘড়িটি তাঁর স্মৃতি বহন করে আসছে। কয়েক বছর পূর্বে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঘড়িটি আধুনিকায়ন ও মেরামত করা হয়।

জিতু মিয়ার বাড়ি

সিলেট নগরীর শেখঘাটে কাজিরবাজার ব্রিজের পূর্বধারে ১.৩৬৫ একর ভূমি জুড়ে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জিতু মিয়ার বাড়ি। কাজির বাজার ব্রিজ নির্মাণের কারণে বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বের বেশ কিছু অংশ ছাড়তে হয়েছে। চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত মুসলিম স্থাপত্য কলার অনন্য নিদর্শন এ দালানটি নির্মাণ করেন খান বাহাদুর আবু নছর মোহাম্মদ এহিয়া ওরফে জিতু মিয়া। বর্তমান কাজিরবাজার গরুর হাট ছিল কাজিদের মূল বাড়ি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে বাড়িটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে বর্তমান জায়গায় বাড়িটি স্থানান্তরিত হয়। দূরদর্শী জিতু মিয়া তার জমিদারি ও বিশেষ করে আলিশান বাড়িটির অস্তিত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে মৃত্যুর আগে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নিজেকে নিঃসন্তান উল্লেখ করে তৎকালীন আসাম সরকারের অনুমোদন নিয়ে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ওয়াকফ করেন। কে বি এহিয়া ওয়াকফ এস্টেট নামে এই এস্টেট-এর মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন তৎকালীন জেলা প্রশাসক। বর্তমানে পদাধিকার বলে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার এ এস্টেটের মোতাওয়াল্লি।

<><><><><><><>

শারদোৎসব উপলক্ষে হাইলাকান্দিবাসী আপামর জনগনকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। উৎসবের এই দিন গুলি সবার জন্য ভালো কাটুক এই কামানায়-

জামাল উদ্দিন চৌধুরী

বিধায়ক প্রতিনিধি

আলগাপুর বিধানসভা সমষ্টি, হাইলাকান্দি

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অনালোচিত দিক

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগৃহীত তথ্য

আশুতোষ দাস

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব শুধু যে বাঙালিকে উদ্দীপিত করেছে তা নয় প্রতিবেশী সাহিত্যকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতের উত্তর-পূর্বের সকল জনগোষ্ঠীর কাছে কবি নজরুল ছিলেন সমাদৃত। আসামের অসমীয়া সাহিত্যের প্রতি তাকালে এ সত্য অনুধাবন করা যায়। সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু আলোকপাত করলে তা বুঝা যাবে। উল্লেখ্য আধুনিক অসমীয়া কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষাদীক্ষা নিতে তখন তারা কলকাতায় চলে যেতেন। অর্থাৎ কিনা উচ্চশিক্ষার জন্য নিজেদের প্রয়োজনে আসামের অনেক অসমীয়া যুবক-যুবতী কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করতে হতো। দেশাত্মবোধক চেতনায় স্বাধীনতার মন্ত্রে কলকাতা সেই সময় টকবক করছে। উল্লেখ্য তখনকার আন্দোলনের শক্তি ও পুষ্টি যোগাচ্ছিল প্রধানতঃ নজরুলের দেশাত্মবোধক গান ও প্রতিবাদী কবিতা ।বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের/কান্ডারী হুশিয়ার গানের পংক্তি সত্যাগ্রহের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে/ দূর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্গিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার! /দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,/ ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ? / /কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ। /এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার ।।/(প্রসঙ্গ সূত্র কান্ডারী হুশিয়ার, সঞ্চিতা ৬১) নজরুল ইসলামের কান্ডারী হুশিয়ার এবং বিদ্রোহীকবিতা সহ নানা লেখায় বিপ্লবীরা পেতো প্রাণ শক্তি।

নজরুল সৃষ্টিকর্ম অসমীয়া তরুণ শিক্ষিত যুবক যুবতীদেরে খুব বেশি প্রভাবশালী করেছে। ভারতের সাহিত্য আকাডেমি প্রকাশ করেছে বিখ্যাত কবি নবকান্ত বরুয়ার অনুবাদে নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী ও অন্যান্য কবিতা" নামে অনুবাদ গ্রন্থ । তাই কবি নজরুল ইসলামের কবিতা অসমীয়া জাতীর কাছে প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে আজও রয়েছে। সেই সঙ্গে অবশ্যই বলা দরকার অসমীয়া জাতি ও আসামের নানান উপজাতিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৪৬ সালে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা অসমীয়া ভাষায় "অরুনোদয়" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, এটাই অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পত্রিকা। ১৮৭২ সালে ক'জন যুবকের প্রচেষ্টায় নজরুলের ভাবাদর্শে গোবিন্দ ফুকনের উদ্যোগে,অসমীয়া ভাষায় "উৎপত্তি সাধিনী সভা" কলকাতায় পাঠরত শিক্ষার্থীরা গঠন করেন, এই সভায় অসমীয়া ভাষার বিকাশে লেখক কবিরা ভাবতে থাকেন, অবশেষে সকল সদস্যদের সম্মতিতে,সংস্থার মুখপত্র হিসেবে নজরুলের ভাবাদর্শে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমোহন আগরওয়ালার সম্পাদনায় "জোনাকি" বের হয়। এই কমিটির প্রত্যেকের মনে "বিদ্রোহী" কবির কবিতা ও গানের দ্বারা এতো বেশি প্রভাবিত হন যে তারা নজরুলের আদলে কবিতা ও গীতরচনা লিখতে থাকেন। বলা যেতে পারে "জোনাকি" ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই অসমীয়া ভাষার নতুন ধারার সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে ; পরিসরের জন্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। সেই প্রসঙ্গে আমার একটি কবিতার অংশ বিশেষ তোলে ধরছি। এতো অশ্রু ছিল চোখে ছল ছল চোখ, / কোটি কোটি লোকের শোকে নির্বাক হলো

মুখ। /পাহাড় সমতল লিখে দিলে নামটি সাম্য, /সবার কাছে এইটাই ছিল তোমার কাম্য।/দেশে দেশে ভেদভাব দেশে দেশে ভ্রান্তি, / তুমি চেয়েছিলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না শান্তি ।/ বসুন্ধরা ডাকছে বুঝি জটরে ভ্রূণ/ নজরুল জেগে আছে বুকের কোটরে শোন।/ (প্রসঙ্গ সূত্র নজরুল / আশুতোষ দাস) বহুবিধ সৃজনী কাজে সংপৃক্ত নজরুলকে দেখে বিস্ময়ে অবাক আমাদেরে নত করে, বিদ্রোহী কবি নজরুল, প্রেমের কবি নজরুল। ভালোবাসার কবি নজরুল, সাম্যের কবি নজরুল,,মানবতার কবি নজরুল, তার সৃজন কর্মনিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার গবেষকদের অন্তর্মোচনের শেষ নেই। পৃথিবীর সাহিত্যে তার আবির্ভাব পথভ্রষ্ট মানুষকে নতুন দিশা দেখায়। এখন ও তিনি প্রাসঙ্গিক। তাকে নিয়ে শত শত গবেষক আলোচনা করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে তিনি শ্রদ্ধায় মননে আগে ছিলেন এখনও আছেন উদ্ভাসিত উজ্জ্বল তারকার মতন, তা নিয়ে কেউ আলোচনা বা কোন গবেষক কিছু লিখেন নি ।বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য আসামের অসমীয়া সাহিত্যে চন্দ্রমোহন আগরওয়ালা তার প্রভাবে কাব্য গ্রন্থ লিখেছেন । অসমীয়া কাব্যের বিখ্যাত কবি অম্বিকা গিরিরায় চৌধুরী কবি নজরুল ইসলামের "অগ্নিবীণার" আদলে লিখেছেন" অগ্নিমন্ত্র "। এই কাব্য গ্রন্থটি পড়লে মনে হবে একবারে নজরুল ইসলামের কাব্য "অগ্নিবীণার" প্রতিলিপি। শুধু তাই নয় অম্বিকা গিরিরায় চৌধুরীকে অসমীয়া সাহিত্যে নজরুলের ভাবাদর্শে কবিতা লিখে অগ্নিকবি বলে খ্যাত হয়ে রয়েছেন। অগ্নিকবির এতই প্রভাব আসামে রয়েছে যে, আসাম সরকার সরকারিভাবে তার জন্মদিন সর্বত্র পালন করেন। তবে নানা সভায় অগ্নিকবি অম্বিকা রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে সেই সময় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কথা তুলনা মূলক ভাবে কাব্য আলোচক বক্তারা অবশ্যই অনেকেই বলে থাকেন, না বললে কাব্য আলোচনাটি তাদের অসম্পূর্ণ হবে। একেবারে বিদ্রোহী কবিতার মতো শব্দ ব্যবহার" অগ্নিমন্ত্র "কাব্যগ্রন্থে" মই বিপ্লবী", কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য যারালেখক কবি বিদ্রোহী কবির ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা হলেন কথা সাহিত্যিক লক্ষীনাথ বেজবরুয়া, কবি প্রযোজক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, কবি শিল্পী বিষ্ণু প্রসাদ রাভা, সঙ্গীত সুধাকর ভুপেন হাজারিকা প্রমুখও। আসামের আধুনিক ডিমাসা সাহিত্যও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ব্যাপক প্রভাবে প্রভাবিত রয়েছে। উল্লেখ্য বিশিষ্ট ডিমাসা লেখক, প্রয়াত যতীন্দ্র থাইসেন

ডিমাছা সাহিত্যে নজরুলে সমস্ত সৃজন কর্ম অনুবাদ করেছেন, এর ভেতর নজরুলের কবিতা, গদ্য, অনেক গীতি রচনা ইত্যাদি রয়েছে। যতীন্দ্র থাইসেনের নজরুল ইসলামের অনুবাদ কর্মকে মান্যতা জানিয়ে সম্মাননা দেয় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আসামের বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলন হাইলাকান্দি নজরুল শতবর্ষ অনুষ্ঠানে, সেই সময় এই সংঘটনের সভাপতির দায়িত্ব ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড° সুবীর কর ও সম্পাদক ছিলেন কলামিস্ট নীতিশ ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয় আসামের মনিপুরী সাহিত্যে ও দু'জন সুলেখক নজরুল ইসলামের সৃজনকর্ম অনুবাদ করে তার ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছেন তারা হলেন বিখ্যাত প্রাক্তন শিক্ষক, কবি, উপন্যাসিক দেব সিংহ যিনি সুব্রাম ছদ্মনামে লেখেন অন্যজন বিশিষ্ট মনিপুরী লেখক ও মনিপুরের একটা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা যমুনা নাইরেঞ্জাম, বিবাহ ও কর্মসূত্রে মনিপুরে থাকলেও তিনি বরাক উপত্যকার জন্মসূত্রে লক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এখন স্থায়ী ভাবে মনিপুরে রয়েছেন। উল্লেখ্য যে মানবতাবাদী কবি যমুনা লাইরেঞ্জাম অস্থির মনিপুরে বসে মানবতার পথপ্রদর্শক কবি নজরুল ইসলামের সঞ্চিতা অনুবাদ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে তার অনুবাদ কর্মকে আসাম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মান্যতা দিয়ে মনিপুরী ভাষার পাঠ্যসূচিতে রয়েছে; এই কাজের জন্য পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। তাছাড়া মনিপুরী ভাষার একজন অগ্রণী সুলেখক কবিও তিনি। তিনি বাংলায় লিখতে ও বলতে পারঙ্গম বলেই নজরুল ইসলামের “সঞ্চিতার “সমস্ত কবিতা অনুবাদ করেছেন, প্রকাশিত হয়েছে নজরুলের অনুবাদগুলো মনিপুরে প্রথম শ্রেণির কাগজে। তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সাহিত্যে ও প্রয়াত কবি কালাসেনা ও প্রয়াত কবি ধনঞ্জয় রাজকুমার ও অনেক অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয় উত্তর পূর্বের নানান ভাষায় নজরুল ইসলামের সাহিত্য তাদের শিল্প-সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, ভাস্কর্যে সর্বোপরি জনমানসে

প্রভাব ফেলে উজ্জীবিত হয়ে রয়েছে। আশীর দশকে আসামের প্রথম মনোরঞ্জন মূলক আমার লেখাগল্পে “পারদর্শনী বাংলা সিনেমায় পরিচালক হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্থ নবনীতা সাহা ডোনা নৃত্যে, “রুনুঝুনু খেজুর পাতার” গানের সঙ্গে নেচেছে । সে ও এক ইতিহাস হয়ে আছে। মেঘালয়ের খাসিয়া ভাষায় প্রথম চলচ্চিত্র “মানিক রাইথনে” নজরুল ভাবাদর্শে পরিচালক বাঁশীর সুরের রাগপ্রধানের কাজ রয়েছে। সেটা আমাদের গৌরবের। অসমীয়া প্রথম সিনেমা “জয়মতী” কথাসাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কাহিনি চিত্রে গজলের এক আসরে নজরুলের গজলের অপূর্ব কাজ রয়েছে । উল্লেখ্য প্রযোজক, কবি, গীতিকার জ্যোতিপ্রসাদ আগওয়ালার “জয়মতী’ সিনেমার গল্পের কাহিনিকার লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন একবারে নজরুল অনুগামী ভক্ত। পরবর্তীতে সঙ্গীত সুধাকর ভুপেন হাজারিকা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার “জয়মতী” সিনেমার কিছু অংশ উদ্ধার করে তথ্যচিত্র করেছেন, সেই অংশে গজলের কাজটি দৃশ্যটি রেকর্ড বন্দি হয়ে আছে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুল আবির্ভাব ও তার সাহিত্য সৃষ্টি আমাদের ভোগবাদী ধ্বস্ত দীর্ণ সভ্যতার পথভ্রষ্ট মানুষদের জ্বলজ্বল আলোর দিশারী হয়ে পথ দেখায় ।তার অনেক কিছুই আজও অনালোচিত রয়ে গেছে, তার সৃজনী সাহিত্য কি ভাবে নিরন্তর বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর মানুষকে প্রাণিত করেছে তা এই মুহূর্তে আমাদের জানা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ইটারনেট প্রযুক্তিতে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেলেও এখন মানুষ আরও বেশি ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, হিংসা, সহিংসতা, জাতপাত, বর্ণবাদ, ভাষাবৈষম্য, ইত্যাদি মানবিক বোধথেকে সরে এসে স্খলন পতনে এক হ-য-র-ল-ব আধারে অন্তঃসার শূন্য সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাই খুব বেশি উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন, বিশ্বপ্রেমিক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য। এখন সহিংসতার ঘেরাটোপে দীর্ঘ আধারে ডুবে যাচ্ছি আমরা ; তাই নজরুল ইসলামের সৃজন কর্ম আমাদের বোধে জাগাবে নৈতিক মূলবোধ। কেননা -তার চিন্তা মননে আজ ও প্রাসঙ্গিক তার সৃষ্টির আলোকোজ্জ্বল বোধে পাবো আমরা নতুন দিশা।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

অল ইন্ডিয়া যুব যাদব মহাসভা

ভোলানাথ যাদব
সভাপতি,
অসম যুব যাদব মহাসভা

কিশোর যাদব
সভাপতি,
হাইলাকান্দি জেলা যুব যাদব মহাসভা

'হাইলাকান্দি' জেলা : অতীত ও বর্তমান

- আহমদ হুসাইন লস্কর -

বরাক নদীর অত্যন্ত স্নেহে ও সযত্নে পালিত তিনটি জেলা- কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। দু'টি পাতা একটি কুড়ির মতো দুই জেলার ঠিক মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আছে হাইলাকান্দি। ১৩২৬.১০ বর্গকিলোমিটার ভৌগলিক স্থান নিয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হাইলাকান্দি জেলার অবস্থান। বর্তমান জনসংখ্যা ৬,৫৯,২৯৬ জন। হাইলাকান্দি নাম নিয়ে অনেক জনরব শোনা যায়। তারই একটা অনুসারে, বরাক নদীর বানের পরে বাঁচার জন্য দেওয়া বাঁধের স্থানীয় নাম "আইল" বা "হাইল" এবং বড়ো-কছারী ভাষার "কান্দি" (কঠিয়া তলী, ধাননি পথার)র থেকে "হাইলাকান্দি" নামের উৎপত্তি। অন্যদের কিছুর মতে, জিলাটির নামটি কুকি শব্দ "হালাম" (সরু রাজ্য, ক্ষেত্র বা অঞ্চল) এবং "কুন্দিয়া" (হালোয়া তলী)র থেকে এসেছে। অন্য একটি সূত্র মতে, এখানে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয় শালি ধান এবং সেখান থেকেই "শাইল কান্দি" এবং কালক্রমে এখনকার নামটি এসেছে। উল্লেখ্য, কিছু পণ্ডিতদের মতে, "হাইলাকান্দি" নামটি সিলেটী শব্দ "হাইলাকুন্দি" থেকে এসেছে।

জেলায় গ্রীষ্মকালে উচ্চ আর্দ্রতা সহ ভারী বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত ২৮৭৩ মিমি এবং আর্দ্রতা ৪৫ শতাংশ। শীতকালে জলবায়ু ঠান্ডা ও শুষ্ক থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে প্রচন্ড ঠান্ডা থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাইলাকান্দি দেশের বাকি অংশের সাথে আকাশপথ, সড়কপথ এবং রেলপথ দ্বারা সুসংযুক্ত। নিকটতম বিমানবন্দর হলো কুম্ভীরগ্রাম এবং রেল স্টেশন হল হাইলাকান্দি এবং বদরপুর। অধিকন্তু, হাইলাকান্দি এবং অন্যান্য স্থানের মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল করে, জেলা সদর থেকে রাজ্যের রাজধানী দিসপুর, গুয়াহাটির দূরত্ব প্রায় ৩৩০ কিলোমিটার এবং এটি দিন ও রাতের বাস পরিষেবা দ্বারা ভালভাবে সংযুক্ত। এখানের সবচেয়ে সাধারণ ভাষা হলো বাংলা, বিশেষ করে সিলেটি উপভাষা বাংলা। হিন্দি, মণিপুরী, ডিমাসা,খাসি ইত্যাদিও প্রচলিত রয়েছে। চা জেলার প্রধান শিল্প এবং চা বাগানে কাজ করে সর্বাধিক জীবিকা নির্বাহ করা হয়। হাইলাকান্দির প্রধান আকর্ষণ হল এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মানুষের নির্মল জীবনধারা।

১৪০০ শতকের আগেও এই ভূ-খণ্ডে জনবসতি ছিল, তার প্রমাণ লালা অঞ্চলের শকওয়ালা দীঘির ঘাটের ইট। ধ্বংস স্তূপে প্রাপ্ত প্রায় ৫৩৪ বৎসর পুরানো এই ইটে লেখা রয়েছে হরিষচন্দ্র মহারাজ শুভমস্তু শকাব্দ ১৪০৯। প্রায় দুই একর জমির উপর খনন করা দীঘি আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। জবরদখল আর চরম সরকারী অবহেলায় ঐতিহাসিক স্থানটি আজ নিজেই ইতিহাস। সবুজ ঘন বনানী ঘেরা হাইলাকান্দির সব ক'টি ঐতিহাসিক স্থানই আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। ভগ্নদশায় দাড়িয়ে আছে জেলার প্রাচীন হিন্দু তীর্থস্থান সিদ্ধেশ্বর শিববাড়ি আর মনাছড়া ভৈরব বাড়ি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র পাঁচগ্রামের মীর আরফিনের দরগা আজ প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ। শহরের দক্ষিণ সীমায় ছাত্তাওয়ালাশার মোকাম সাজানো গোছানো থাকলেও মিজোরাম সীমান্তবর্তী গাড়মুরা পাশ্ববর্তী পাঁচ-পীরের মোকাম আজ জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। জনবসতি সবুজ অরণ্য আর অসংখ্য টিলাভূমিতে সাজানো যেন অতীতের হাইলাকান্দি আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেকটা সঙ্গীন।

সরকারী তথ্যে জেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা ৬৬ হাজার ৯০ হেক্টর। প্রামাণ্য দলিল মতে হাইলাকান্দি একসময় ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে। শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাছাড়ী রাজার হাত হয়ে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট এই রাজ্যের অধিকার নেয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ১৮৬৮ সালে হাইলাকান্দি শহরের পত্তন হয়, তখন তাকে সিভিল স্টেশন বলা হত। ১৮৬৯ সালের ১ জুন হাইলাকান্দি মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। শতাধিক বছর পর ১৯৮৯ সালের ১ অক্টোবর জেলা পর্যায়ে হাইলাকান্দি উন্নীত হয়। হাইলাকান্দি মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হতে সর্বস্তরের জনগণের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে সম্ভব হয়েছিল। তখন রাজ্যে অসম গণ পরিষদ সরকার ছিল।

হাইলাকান্দি সিভিল স্টেশন ১৯১০-১১ সালে টাউন ইউনিয়নে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর ১৯২৪ সালে হাইলাকান্দি টাউন কমিটি গঠিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী মরহুম আব্দুল মতলিব মজুমদার। ১৯৬৮ সালে টাউন কমিটি মিউনিসিপালিটিতে উন্নীত হয় এবং এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আইনজীবী কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। হাইলাকান্দির প্রথম মহকুমা শাসকের দায়িত্বে ছিলেন আই পি. হার্বট। তার নামেই হাইলাকান্দি সদর বাজারের নামকরণ হয় বরইতলী বাজার থেকে হার্বার্টগঞ্জ বাজার। বরইতলী কতুয়ালী আজ হাইলাকান্দি সদর থানায় উন্নীত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছিয়ে ছিল না হাইলাকান্দি ভূ-খণ্ড। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হাইলাকান্দিও। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী সিপাহীরা করিমগঞ্জের লাতু দিয়ে প্রবেশ করে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আশ্রয় নেয় আলগাপুর-মোহনপুরের এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে। দেশী বেইমানদের বিশ্বাসঘাতকতায় তারা আক্রান্ত হন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে। রজব আলীর নেতৃত্বে প্রাণপণ লড়াই করে সেখানে ১৮ সেনানী শহীদ হন। ১৮৫৭ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্রিটিশের সংগে এই অ-সম যুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে স্থানীয়রা এলাকার নাম রাখেন রণটিলা। 'রণটিলা সংরক্ষণ সমিতি' নামে একটি স্থানীয় সংস্থা প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানে দিনটি পালন করলেও সরকারী ভাবে আজও

স্থানটি ঐতিহাসিক স্মারক স্থল হিসেবে সম্মান লাভ করতে পারেনি। গড়ে উঠেনি কোন পর্যটন কেন্দ্রও। সিপাহী বিদ্রোহ হাইলাকান্দির নিস্তরঙ্গ জীবনকে আন্দোলিত করেও ছেড়ে দেয়নি। ১৯০৫, ১৯২১, ১৯৪২ সালের নানা অধ্যায় সহ স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিটি স্তরে যোগদান রয়েছে এই ভূ-খণ্ডের। বিপিন চন্দ্র পাল, মাষ্টারদা সূর্য সেন, জওহরলাল নেহরু, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাদের পদধূলিতে হৃদ্ধ হয় হাইলাকান্দির ভূমি। ১৯৩৮ সালে বর্তমান রবীন্দ্র ভবনের পাশে হওয়া নেতাজী সভা নিয়ে আজও উদ্বেলিত হাইলাকান্দির মানুষ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও জওহরলাল নেহরুর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী আজও বহু ঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। হাইলাকান্দির সৌভাগ্য যে এখানকার ডাক্তার মন্মথ চৌধুরীর মত ব্যক্তিত্ব নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে ক্যাপ্টিন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। হাইলাকান্দির অধিকাংশ যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে কারাবরণ অমানুসিক অত্যাচার ও মৃত্যুবরণ করে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মবলিদানের কাহিনী আজ ব্রাত্য। ব্রাত্য দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে হাইলাকান্দির পার্শ্ববর্তী কোম্পানীগঞ্জের চান্দপুর-নারাইনপুর ও লালা পার্শ্ববর্তী চন্দ্রপুর গ্রামে গড়ে উঠা বিমানঘাটি। যুদ্ধ শেষে বিমান বহনের ধ্বংসাবশেষ ও নির্মিত দালানকোঠা এখানে ফেলে চলে যায় ব্রিটিশ বাহিনী। পূর্বপুরুষের কর্মভূমির খোঁজ নিতে প্রায় ৮০ বছর পর চন্দ্রপুরে এসেছিলেন ইংলণ্ডের এলেন পালমার। পরাধীন ভারতে শুধুমাত্র আন্দোলনই নয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও রেখেছিল হাইলাকান্দি বিশেষ অবদান । শিক্ষার প্রসারে তদানীন্তন মহকুমায় গড়ে উঠে ৩ নং নিশ্চিন্তপুর নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬নং সরসপুর এল. পি. স্কুল, হাইলাকান্দি সরকারী ভিক্টোরীয়া মেমোরিয়েল বিদ্যালয় ও লালা উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের মতো সনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যিকারের মানুষ হওয়া হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশে-বিদেশে সুনামের সঙ্গে অধ্যয়ন, গবেষণা ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আজ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবনকে উজ্জ্বল করার সাধনায় ব্রতী রয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতাকালের চা বাগান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পাশাপাশি হাইলাকান্দি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে এগিয়ে যায়। নবজাগরণের আলোর ঝরণায় গোটা ভারতবর্ষ যখন উদ্ভাসিত তখন পিছিয়ে ছিলনা হাইলাকান্দিও। ১৯০৭ সালে হাইলাকান্দিতে ফুটবল খেলার বীজ রোপণ করেন তদানীন্তন মহকুমাধিপতি 'জনস্টন'। চা বাগানের ব্রিটিশ সাহেবরা মনাছড়ায় গড়ে তুলেছিলেন 'মনাছড়া ক্লাব' নামক এক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান।

হাইলাকান্দির অন্যতম প্রধান জলধারা হলো ধলেশ্বরী। ক্ষীণ কলেবর নিয়ে হাইলাকান্দি শহরকে দ্বিধাবিভক্ত করে মিশে গেছে বরাকের জলধারায়। কিন্তু এমনটা ছিলনা কখনও। লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম নিয়ে হাইলাকান্দি ভূখণ্ড দিয়ে খরস্রোতা এই নদী বয়ে চলেছিল অনন্তকাল ধরে। কাটলিছড়ার অদূরবর্তী গাজাখাউরী থেকে ছিল আরেকটি ক্ষীণ জলধারা যা উত্তরমুখী হয়ে মিশেছে বরাকে। এই ক্ষীণ জলধারাটি আজ জেলার প্রধান নদী। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারী এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রকোপে এই ভূ-ভাগের বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ওই সময়ে গাঞ্জাখাউরী দিয়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীগর্ভ প্রায় চার কিলোমিটার বালুময় সমতলে পরিণত হয়। ধলেশ্বরীর উজানের জলধারা অখ্যাত ক্ষীণধারার সঙ্গে মিলে সৃষ্টি হয় কাটাখাল নদী। বুজে যাওয়া ধলেশ্বরী ভেদ করে আজ চলে গেছে ৬ নং জাতীয় সড়ক। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির খেয়ালের খেলায় ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে সুনামধন্য বক্রিহাওর। হাজার প্রজাতির মাছের আকর আশিয়াল বিল। ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থে এ উপত্যকায় শুরু করেছিল চা পাতার চাষ। ১৮৫৫ সালে হাইলাকান্দি তে চা চাষ আরম্ভ হয়। বণিব্রীজ চা বাগানটি প্রথম যাত্রা শুরু করে হাইলাকান্দিতে। আজ মোট ১৭টি চা বাগান দাড়িয়ে আছে এই জেলায়। কয়েকলক্ষ মানুষের জীবীকা এই চা বাগানকে ঘিরে। শ্রমিকের কাজ করতে হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশরা এনেছিল পুরুলিয়া, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও। কাঞ্চনপুর চা বাগানে রয়েছে তেলেগুবাসীদের তেমনি একটা গ্রাম (সইদপুর, নাইডু পাড়া)। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের বাস হাইলাকান্দিতে। মণিপুরী, নাগা, সাওতালী, বাঙালি, অসমীয়া, রিয়াং, রাজস্থানী সব ভাষাভাষী মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থনে হাইলাকান্দি যেন এক মিনি ভারতবর্ষ। ব্রিটিশের বদান্যতায় ১৯০৪ সালে কাটাখাল থেকে লালাঘাট পর্যন্ত পাতা হয় নিরোগেইজ রেল লাইন। চা আর বনজ সম্পদ রপ্তানীর জন্যই গড়ে উঠে এই রেল লাইনটি। পরবর্তী কালে লালাঘাট বাদ দিয়ে মিটারগেইজ সম্প্রসারিত হয় লালা থেকে প্রথমে জামিরা অবশেষে সংযোজিত হয় মিজোরামের ভৈরবীর সংগে। এখন সম্প্রসারিত লাইনে ছুটছে ব্রডগেইজ। হাইলাকান্দি জেলায় মোট ১৩টি স্টেশন রয়েছে। এক সময় ভারতের আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রমের কাছে মাথা নত করে ব্রিটিশ শাসকরা। লক্ষ লক্ষ নাম জানা-অজানা শহীদের রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হয় রাণীমা ভারতবর্ষে। স্বাধীনতার স্বাদ পায় মহকুমা হাইলাকান্দিও। এই ভূ-খণ্ডে সেদিন প্রথম স্বাধীন ভারতের ত্রিরঙ্গা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক উপেন্দ্র চন্দ্র রায়। ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রসারে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্টেডিয়াম। সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য নানা প্রেক্ষাগৃহ। সরকারের প্রচেষ্টায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উত্তরণ ঘটেছে। এসবের পরেও কোথায়ও যেন অনেক কিছু প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়ার বেদনা বুকে পীড়া দেয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ সবাইকে সামনে টানছে তাই হারিয়ে যাচ্ছে লাঙল দিয়ে হালচাষ। কাঁধে ধানের মুঠো নিয়ে চাষীর বাড়ি ফেরা। হারিয়ে গেছে লাই খেলা, বাঁধ ভাঙি, লাইর এক্কাধুক্কা, ষোলগুটির মতো অসংখ্য গ্রামীণ খেলা। মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটছে আধুনিকতার পিছনে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। আত্মকেন্দ্রীকতায় গুটিয়ে যাচ্ছে মানুষ। 'হাম দো হামারে দো' এই

স্লোগানের বাইরে কান পাতার সময় নেই। ছেলেমেয়েদের সাহেব গড়ে তুলতে মায়েরা হেঁসেল ছেড়ে পায়চারি করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বারান্দায়। প্রশ্ন জাগে ফলে ফুলে সেজে উঠা ধরনীতে এটাই কী বাস্তব জীবন। স্বাধীন ভারতের বাস্তব ভূ-খণ্ড হাইলাকান্দিও ধনে জনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে স্থানে স্থানে জনপদ, প্রতিনিয়ত উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ। নিজেদের বসতি স্থাপনে বন্যপ্রাণীদের বসতি সংকোচিত করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না সুসভ্য মানুষ। ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ধ্বংসকে। নাগরিক সভ্যতা প্রসারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্তি আটকাতে স্বচ্ছতা আর বৃক্ষরোপণে ব্রতী হতে হবে আমাদেরকে। হাইলাকান্দির প্রকৃতিকে সবুজে সাজিয়ে তুলে আগামী প্রজন্মকে তাজা নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে আমাদেরকে। নাহলে উত্তরসুরীর অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে না কোনোদিন।

হাইলাকান্দি'র উল্লেখযোগ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান :

১) শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ; শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ ১৯৫০ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত শিশির কর শাস্ত্রীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলেজের জমি দান করেছিলেন শিক্ষাবিদ প্রতাপ চৌধুরী। নাথ। প্রয়াত শ্রীচাঁদ সারদা কলেজের ১ম ভবনটি দান করেন। কলেজটি ১৯৫৬ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে এটি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। কলা ও বিজ্ঞান শাখায় প্রায় ১৩০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। এটিতে ৫৫ জন প্রভাষক এবং ২৪ জন অশিক্ষা কর্মী রয়েছে। এখানে পড়ানো হয় ইংরেজি, বাংলা, মণিপুরি, সংস্কৃত, ফার্সি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং পরিসংখ্যান। কলেজটি মণিপুরী এবং রসায়ন ব্যতীত সকল বিষয়ে ডিগ্রী অনার্স স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করছে।

২) আব্দুল লতিফ চৌধুরী কলেজ: (আলগাপুর) ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। কলেজের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রশংসনীয়। এটির চারটি তলা রয়েছে এবং তাদের সবকটিই সুসজ্জিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এটি প্রধান শহর হাইলাকান্দি থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। কলেজে কলা ও বাণিজ্য দু'টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। কর্মী সংখ্যা ৩৫ অভিজ্ঞ প্রভাষক এবং ১৪ জন অশিক্ষক কর্মী নিয়ে গঠিত। এখানে ইংরেজি, বাংলা, মণিপুরি, সংস্কৃত, ফারসি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, আর্থিক অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, অফিস ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায়িক আইন, কস্ট অ্যাকাউন্টিং, অডিট, অপারেশন রিসার্চ এবং পরিসংখ্যান। কলেজটি বাণিজ্য ধারা ব্যতীত সকল বিষয়ে ডিগ্রী অনার্স পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করছে।

৩) সরকারি ভিএমএইচএস স্কুল; এই এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯০৩ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মিডল ইংলিশ স্কুল নামে স্কুলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৯১৩ সালে প্রথম প্রধান শিক্ষক বাবু রাজ কুমার সেনের সাথে স্কুলটি হাইস্কুল পর্যায়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়টি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এইচএস বিভাগে পাঠদান ইংরেজি এবং বাংলা উভয় মাধ্যমেই দেওয়া হয়। স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের একটি নিবেদিত দল রয়েছে। বিদ্যালয়টির উল্লেখযোগ্য ফলাফলের একটি গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে এবং বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পদে কাজ করছে।

হাইলাকান্দি'র পত্র-পত্রিকা :

হাইলাকান্দি থেকে এক সময় বহু সাপ্তাহিক-অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হতো। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - কাছাড়, উত্তর-পূর্ব, পূর্বায়ন, দিবাকর, ডালিম, ধলেশ্বরী, অনির্বাণ শিখা, যুগাঞ্জলি, সময় সমাচার ও ইংরেজি সাপ্তাহিক কাছাড় ট্রিবিউন। উল্লেখিত তালিকা থেকে বর্তমানে দু'তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান থেকে নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে । বাকি সবকটির প্রকাশনা বর্তমানে বন্ধ। হাইলাকান্দি জেলা থেকে ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে প্রকাশনা অরম্ভ করে জেলার ইতিহাসে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'দৈনিক খবর আমাদের'। পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় হাইলাকান্দি গুদামঘাট রোডে অবস্থিত। পত্রিকাটি তার নিজস্ব ভাবনায় সমাজের বঞ্চিত ও নিপিড়ীতের প্রতিবাদী কণ্ঠ হিসেবে সমাজ ও জাতির সেবায় নিবেদিত। সম্পাদনায় রয়েছেন হাইলাকান্দি টাউন ওয়ার্ড নং ১১ এর বাসিন্দা আহমদ হুসাইন লস্কর ও করিমগঞ্জ বছলার বাসিন্দা আবু নাসের আব্দুল হাই সিদ্দিকী। এছাড়া হাইলাকান্দি থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে বহু লিটল ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিশের দশকে হাইলাকান্দিতে হাতে লিখিত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ হতো। উপেন্দ্র মোহন নাথ ও ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য এ জেলার লিটল ম্যাগাজিনের জনক। তাদের প্রচেষ্টায় সচিত্র ভারত, জয়ন্তি ও জ্ঞানের আলো লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাইলাকান্দি থেকে মোট ৪২ টি লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে ২/৩ টি লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। বাকিগুলো বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ করলেও দু'চারটি সংখ্যা উপহার দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হলো, সাহিত্য, চম্পাকলি, আলোর দিশারি, হাইলাকান্দি, অশান্ত, আলো হাওয়া।

অনুসন্ধান

মানব সভ্যতায় গোয়েন্দাগিরি

উত্তম কুমার সী

জনপ্রিয়তার নিরিখে গোটা বিশ্বে এখনও এক নম্বর স্থানে রয়েছে অপরাধ সাহিত্য। জেমস হেডলি চেজ, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, ইয়ান ফ্লেমিং, আগাথা ক্রিস্টি বা নিক কার্টার যেমন বিশ্বের অসংখ্য পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, অদ্রীশ বর্ধন, নিমাই ভট্টাচার্য বা স্বপন কুমার আলোকিত করে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাটি। রহস্য সাহিত্যের স্রষ্টারা এভারগ্রিন। আজও মানব হৃদয়ে সমানভাবে তারা উত্তেজনা জাগিয়ে প্রতিজন পাঠককে গড়ে তোলেন এক একজন গোয়েন্দা। সবার তৃতীয় নয়নকে খুলে দেন তাঁরা। আদিকাল থেকে একদিকে অপরাধ এবং তার পাশাপাশি অনুশাসন তৈরি হয়ে আজ এদিকটাও আধুনিকতায় পা রেখেছে। অপরাধ, অপরাধী, গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দাগিরির অতীত কিন্তু খুবই আকর্ষণীয়। এখানে তার সূচনা পর্ব তুলে ধরা হল। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ১১০০ বছর আগের ঘটনা। পোনটাস প্রদেশের সম্রাট ছিলেন মিথ্রাইডিস। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী, বদমেজাজি ও হিংস্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের আধিপত্য কায়েম করার জন্য পোনটাসের সাধারণ প্রজা থেকে শুরু করে নিজের অনুগত মন্ত্রী, পারিষদদেরও অত্যাচারে জর্জরিত করে মেরে ফেলতেন। অত্যাচারী ও খুনি সম্রাট হিসেবে মিথ্রাইডিসের দুর্নাম ছিল। মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে অভিষেক ঘটে মিথ্রাইডিসের। কিন্তু সেকালে কিশোর সম্রাটকে ফাঁসিয়ে ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু হয়। রাজনীতি-কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ মিথ্রাইডিস রাজ্য ও রাজপ্রাসাদের অশান্তির কথা জেনেও কিছু করতে পারলেন না। তবে তাঁর বিরুদ্ধে রাজপুরীর অন্দরমহলেই যে গভীর চক্রান্ত চলছে, তা বিভিন্ন ঘটনায় মিথ্রাইডিস টের পেলেন। কী সেই চক্রান্ত? সেটা জানতে উদগ্রীব কিশোর সম্রাট নিয়োগ করলেন এক গুপ্তচর। যে রাজপ্রাসাদের সবার খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই গুপ্তচর এসে মিথ্রাইডিসকে জানাল যে রাজাকে খুনের চক্রান্ত চলছে। মিথ্রাইডিসকে খুন করে তাঁর ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসাতে চান তাঁর মা। তিনিই সব চক্রান্ত ও অশান্তির মূলে। কিশোর মিথ্রাইডিস এ খবর শুনে

খুব ভয় পেলেন। নিজের মা-ভাই যেখানে তাঁর অনিষ্ট চাইছেন, সেখানে নিশ্চিন্তে সিংহাসনে বসে থাকা সমীচিন নয়। নিজের প্রাণ বাঁচাতে হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না জানিয়েই অন্তর্ধান হলেন কিশোর মিথ্রাইডিস। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। আর এই সময়েই সংগ্রহ করলেন শক্তি, বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস। বেশ কয়েকবছর এভাবে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে অনেক বন্ধুও তৈরি করে নিলেন মিথ্রাইডিস। এদের মধ্যে চোর-ডাকাতই ছিল বেশি। মিথ্রাইডিসের বয়স বেড়ে যখন যৌবন, তখন ভরপুর আত্মবিশ্বাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ছোট ভাইকে সরিয়ে পুনরায় রাজ সিংহাসনে বসেন।

কিশোর মিথ্রাইডিস এখন যুবক। মানসিকতা অনেক বেশি দৃঢ়। আর দীর্ঘকাল ঘুরে বেড়ানোয় অনেকটা অত্যাচারী ও বদমেজাজি মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। পুনরায় সিংহাসনে বসে ঠাণ্ডা মাথায় আগাম চিন্তা করেই মিথ্রাইডিস প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে থাকলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী প্রধান দুই শত্রু নিজের মা ও ভাইকে বন্দি করলেন। ঘরের শত্রু মা ও ভাইকে গ্রেফতার করে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। রাজপ্রাসাদের অন্দরের চক্রান্ত ছাড়া গোটা রাজ্যে কোনও রাজবিরোধী কার্যকলাপ ছিল না। এমনকী কোনও সমস্যাও নেই। মা ও ভাইকে বন্দিশালায় পুরে এবার সম্রাট বের হলেন দেশ জয় করতে। এভাবেই একের পর এক ঘটনায় মিথ্রাইডিসের অত্যাচারী মানসিকতা প্রকট হয়। জীবনে কাউকেই বিশ্বাস করেননি মিথ্রাইডিস। নিজের স্ত্রী, মা, ভাই বা অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের চেয়ে তিনি চোর-ডাকাত বা খুনিদের বেশি বিশ্বাস করতেন। তারাই ছিল সম্রাটের প্রিয় বন্ধু। তাঁর এক বন্ধুর নাম সেলেনকাস। দু'জনে মিলে জীবনে অনেক ডাকাতি ও খুন করেছিলেন। তবে বন্ধুরাও কথার খেলাপ বা কোনও চক্রান্ত করে মিথ্রাইডিসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অনেক বন্ধুদের তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে খুন করেন। মিথ্রাইডিস এমনই নির্দয় ছিলেন যে সন্দেহের কারণে নিজের স্ত্রীকেও খুন করেন। মিথ্রাইডিস রোমান মানুষদের খুব ঘৃণা করতেন। লোকমুখে একটা রটনা ছিল, তিনি নাকি প্রায় এক লক্ষ রোমান নাগরিককে খুন করেছিলেন। যদিও এই রটনার ঐতিহাসিক সত্যতা জানা যায়নি। মিথ্রাইডিস এমন এক সম্রাট ছিলেন যার প্রতিটি পদক্ষেপেই আসে সাফল্য। পোনটাস প্রদেশে ব্যর্থতা বলে কোনও শব্দই ছিল না সেদিন। সমস্ত চক্রান্ত, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে মিথ্রাইডিসের সাফল্যের কারণ ছিল গোয়েন্দাগিরি বা স্পাইং। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অভিনব পদ্ধতিতে তিনি লোক লাগিয়ে খবর সংগ্রহ করতেন। সেকালে গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা কারও জানা না থাকায় খুব সহজেই খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হত। যার উপর ভিত্তি করে মিথ্রাইডিস

নিজের সাম্রাজ্য কায়েম রেখেছিলেন। পোনটাসের সম্রাট মিথ্রাইডিসই প্রথম গুপ্তচরের ব্যবহার করেছিলেন, বা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি। মিথ্রাইডিসের নিজের স্বার্থে ব্যবহৃত স্পাইদের জীবন বৃত্তান্ত বা কোনও ঘটনা গোয়েন্দা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর আগে ব্যবহারিক জীবনে সরকারিভাবে কোনও গুপ্তচর বা গোয়েন্দার ব্যবহার জানা যায়নি। তবে ঠিক সেই সময়ে ফিলিস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে গোপন খবর সংগ্রহ করতে সুন্দরী মহিলাদের ব্যবহার করার একটা প্রচলনের কথা শোনা যায়। সে সময় ড্যালাইলা বলে এক অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল গুপ্তচর হিসেবে। ড্যালাইলা সম্রাট স্যাম্পসনকে নিজের অপরূপ দেহ সৌন্দর্য দিয়ে পুরো বশ করে ফেলেছিলেন। আবেদনে সাড়া পেয়ে সম্রাট ক্রমশ ড্যালাইলার ঘনিষ্ঠ হতে থাকলেন। এমন সুন্দরী মহিলার সঙ্গ পেতে পাগল হয়ে উঠলেন তিনি। ক্রমশ দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। ড্যালাইলার রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্যের ফাঁদে একসময় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন স্যাম্পসন। নিজের অতি গোপনীয় খবর খুব সহজেই ড্যালাইলার কাছে প্রকাশ করতে থাকেন। ফলে জীবনে মারাত্মক বিপদসঙ্কুল অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় স্যাম্পসনকে। গোয়েন্দাগিরি বা গুপ্তচরের কাজে আধুনিক যুগেও সুন্দরী-বিচক্ষণ মহিলাদের ব্যবহার করা হয়। কারণ, সুন্দরী মহিলার মোহে আকৃষ্ট হয় যে কোনও পুরুষ। ফলে মোহের বশে এদের রূপ-যৌবনের সামনে গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায়। এই মহিলা ব্যবহারের ঘটনাটিও সেই খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ বছর আগে প্রথম পাওয়া যায়। বাইবেলের মধ্যেও অনেক গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। রাহাব নামের এক পতিতা ছিলেন। জেরিকো নামক এক শহরে রাহাব নিজের সুসজ্জিত বাড়িতেই দেহব্যবসা চালাতেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী সহ সমস্ত বড়লোকদের নিত্য আনাগোনা ছিল রাহাবের কুটিরে। আসরে বসে এরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গোপন বিষয় নিয়ে পরামর্শ-আলোচনা করতেন। ঘরের ভিতর লুকিয়ে বসে রাহাব ওই সব আলোচনা শুনতেন। এছাড়া একাকী খদ্দেরের সঙ্গে কাটানোর সময়ও রাহাব বিভিন্ন গোপন বিষয় খুব সহজেই জেনে নিতেন। এসব জানার কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন ইজরায়েলের গুপ্তচর। সব খবর যথাসময়ে ইজরায়েলকে জানিয়ে পারিশ্রমিক বা উপহার আদায় করে নিতেন তিনি। বাইবেলে এরকম অসংখ্য গুপ্তচরের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আলেকজাণ্ডার যখন এশিয়া আক্রমণে বের হন তখন তাঁর কাছে বিভিন্ন সূত্রে খবর এল যে অনেক গ্রিক সেনা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। কিন্তু রাজার নির্দেশ অমান্য করতে না পেরে বাধ্য হয়েই মুখে কিছুই প্রকাশ করছে না, কিন্তু মনে মনে বহু সেনা অসন্তুষ্ট। কিন্তু কেন? আলেকজাণ্ডার এর কারণ জানতে পারলেন না কারও কাছ থেকে। অনেক চিন্তা করে তিনি সেনাবাহিনীর অনীহা বা অসন্তোষের কারণ জানতে এক ফন্দি আঁটলেন। কারণ, সামনে অনেক দূর এগোতে হবে লড়াই করে। এখনই অসুবিধাগুলি মিটিয়ে নেওয়া দরকার। একদিন আলেকজাণ্ডার সেনা সমাবেশ ডেকে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। শেষে বললেন তিনি নিজের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠাচ্ছেন গ্রিসে। যদি সেনা জওয়ানরা নিজেদের বাড়িতে চিঠি পাঠাতে চায় তবে তারাও লিখতে পারে। বিশেষ লোক মারফৎ চিঠিগুলি গ্রিসে পাঠানো হবে। রাজার এই প্রস্তাব পেয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে হইচই পড়ে যায়। কতদিন থেকে তাঁরা বাড়ি ছাড়া, পরিবার পরিজন ছাড়া। সবাই আনন্দে নিজেদের অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখল। যথাসময়ে বিশেষ ডাক হরকরা দিয়ে চিঠিগুলি গ্রিসের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েও দেওয়া হয়। সব সেনাদের সামনেই হয়েছে। তাই সবাই খুব খুশি। কিন্তু গোপন খবর কেউ জানল না। নিজের কৌশল অনুযায়ী আলেকজাণ্ডার ডাক হরকরাকে ডেকে আনলেন। রাজার নির্দেশে সে চিঠির ব্যাগ হস্তান্তর করল। ব্যাগের চিঠিগুলি একে একে খুলে পড়ে নিলেন আলেকজাণ্ডার। চিঠিগুলি পড়ে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না কোন কোন সেনা যুদ্ধে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক এবং কেন। চিঠিতে সেনা জওয়ানরা নিজেদের অসুবিধা, দুঃখ-কষ্টের কথা পরিবারের স্বজনদের কাছে লিখেছে। সব জেনে নিলেন আলেকজাণ্ডার। সেই অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নিয়ে বিপুল সাফল্য পেয়েছিলেন তিনি। আলেকজাণ্ডারই প্রথম সেনাবাহিনীর কর্মীরা সরকারি গোপন খবর আত্মীয় স্বজনদের কাছে বা বাইরের কারও কাছে পাচার করছে কি না তা জানার প্রথা চালু করেন। ইতিহাসই এর সাক্ষী। অবশ্য নিজেদের বুদ্ধি খরচ করে সে সময় রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থে অনেক রাজাই বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছেন। তবে রাজার চোখে ধুলো দিয়ে গোপন খবর পাচার করার অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগের এক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। সম্রাট দারায়ুসের গভর্নর ছিলেন হিসতিয়াস নামের এক ব্যক্তি। বিভিন্ন কারণে সম্রাটের প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একসময় হিসতিয়াস গোপনে দারায়ুসকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু কোনও শত্রু দেশ আক্রমণের চেষ্টা করছে না দেখে তিনি অন্য পন্থা নিলেন। দারায়ুসকে সিংহাসন থেকে সরাতে হলে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সে চেষ্টায় ছিলেন হিসতিয়াস। শুধু হিসতিয়াসই নন, সম্রাটের ব্যবহারে অতিষ্ঠ ছিলেন নৌ-বাহিনীর সৈন্যরাও। দারায়ুসের নৌ-বাহিনীর প্রধান ছিলেন আরিস্তগোরাস।

আবার তিনি হিসতিয়াসেরও খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের জন্য দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হলে আরিস্তগোরাসকে চাই হিসতিয়াসের। কিন্তু কীভাবে খবর পাঠাবেন। আবার এমনভাবে খবর পাঠাতে হবে যাতে সম্রাট টের না পান। হিসতিয়াস গোপনে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের খবর পাঠাতে এক আশ্চর্যজনক পথ বেছে নিলেন। এক বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের সাহায্য নিলেন তিনি। তাঁকে ডেকে এনে প্রথমে তাঁর মাথার সব চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়া হল। এবার সেই টাক মাথার ওপর উল্কি কেটে গোপন ষড়যন্ত্রের খবর লেখা হল আরিস্তগোরাসের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন ওই ক্রীতদাসকে এভাবে রেখে দেওয়া হয়। পরে তাঁর মাথায় আবার চুল গজিয়ে উঠলে তাকে হিসতিয়াস পাঠালেন সীমান্তে, আরিস্তগোরাসের কাছে। রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সম্রাটের নিজস্ব বাহিনী ও গুপ্তচররা ক্রীতদাসটিকে তল্লাশি চালালেও কিছুই পায়নি। ফলে সে খুব সহজেই আরিস্তগোরাসের কাছে চলে যায়। সে নৌ প্রধানকে গিয়ে বলল, আমার মাথার চুল কাটিয়ে দিন। আপনার জন্যে আমার প্রভু হিসতিয়াস খবর পাঠিয়েছেন। আরিস্তগোরাস এবার নাপিত ডেকে ক্রীতদাসটির চুল কাটিয়ে বন্ধুর পাঠানো চিঠি পড়ে নিলেন। এভাবে গভর্নর আর নৌ প্রধানের যোগাযোগের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দারায়ুসের বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহ সম্ভব হয়। অবশ্য এই বিদ্রোহ সফল হয়নি। তবে বিদ্রোহ থামাতে দীর্ঘ ছয় মাস লেগেছিল সম্রাট দারায়ুসের। ন্যাড়া মাথায় উল্কি কেটে গোপন খবর পাঠানোর এই পন্থা গোয়েন্দা ইতিহাসে এটাই প্রথম। এমনকী সম্রাটের চোখে ধুলো দিয়ে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রও প্রথম করেছেন হিসতিয়াস। গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস খুব দীর্ঘ। এখানে শুধু সূচনাকাল নিয়েই আলোচনা করা হল। আগামীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরার বাসনা রইল।

<><><><><>

CENTRAL DIAGNOSTICS

উন্নত মানের চিকিৎসা সেবার স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান

Central Road, Lala, আসাম গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক এর নিচের তলায়

Ph. No.- 7002501184 / 6002503741

Visiting Doctors

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ আজগর আলি আহমেদ *(প্রতি রবিবার)*

মেডিসিন এবং কিডনি বিশেষজ্ঞ

ডাঃ অনির্বান সিনহা *(প্রতি রবিবার)*

ডাঃ দেবাশীষ খারিগাপসা *(মঙ্গলবার*

অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ রাকেশ সিনহা *(প্রতি রবিবার)*

ডাঃ অঙ্কুর ভট্টাচার্য *(শনিবার)*

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ গৌরব দাস (রবিদাস)

সার্জারি বিশষজ্ঞ

ডাঃ অনুপম পাল

ডাঃ জাহাঙ্গীর লস্কর

জেনারেল মেডিসিন

ডাঃ ইসমৎ আহমদ বড়ভুইয়া (প্রতিদিন)

ডাঃ আব্দুল ওয়াদুদ

ডাঃ জায়নাল আবেদীন (মঙ্গলবার)

ENT বিশেষজ্ঞ

অঙ্কিতা গুপ্তা *(বুধবার)*

প্রতিদিন এখানে সব ধরণের ব্লাড টেস্ট, আল্টা সনোগ্রাফি, এক্স-রে, ইসিজি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে।

হাইলাকান্দির শিববাড়ি দুর্গাপূজার একাল-সেকাল

- সন্তোষ কুমার মজুমদার -

হাইলাকান্দি জেলা সদরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত শিববাড়ি দুর্গাপূজা কমিটির ব্যবস্থাপনায় এ বছর দেড়শত বছর পূর্তি উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এবারের দুর্গাপূজা বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে। গত বছর মহাসপ্তমীর দিন রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই শিববাড়ির দুর্গাপূজা পরিদর্শনে আসেন। তখন মন্দিরের কর্মকর্তারা মন্দিরের রেজিষ্ট্রেশন না থাকার বিষয়টি মূখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে তুলে ধরেন। মূখ্যমন্ত্রী সাথে সাথেই জেলা আয়ুক্তকে এব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। যার ফলে জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় শিববাড়ি জমির ভূমি দাতাদের দানপত্র রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন হয়। এই মন্দিরের ভূমিদাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন - প্রয়াত গণেশপ্রসাদ কানু, প্রয়াত রাম উগ্র কানু ও সর্দার চান্দালাল সিংহ, প্রয়াত বয়েজ প্রসাদ কানু।

পুরাতন এই শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতারা হলেন প্রয়াতা আচম্বী কাহার ও তার স্বামী পার্বতী কাহার। পুনঃ নির্মিত শিবন্দিরের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাদের নাম ফলকে রয়েছে। অতীতে যাদের হাত ধরে দুর্গাপূজা শুরু হয়েছিল তারা আজ আর নেই। তারা হলেন - সুনীল কুমার ঘোষ, শশাংক শেখর দেব, বীরেন্দ্র, কুমার বিশ্বাস, রাকেশ রঞ্জন দেব, প্রভাস চন্দ্রবর্ত্তী, অশোক দত্তগুপ্ত, অঞ্জন দত্তগুপ্ত, চন্দন দত্ত, বিজন দত্ত, কনক চক্রবর্ত্তী, রনবীর দেব প্রমূখ। দেশ স্বাধীনতার পর থেকে হাইলাকান্দি শহরের মধ্যেই প্রচুর ভূসম্পত্তি বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধিনে ছিল। বর্তমানে অতীতের সেই স্মৃতি বহুলাংশে বিলুপ্তি ঘটেছে। এমনকি শিববাড়ি সংলগ্ন ভূমিদাতাদের বাড়ির দালানে একটি হিন্দি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। তৎকালীন সময়ে রাজ্য বিধানসভার তাবড় তাবড় মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়কদের মধ্যে গৌরী শংকর রায়, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জী, হাইলাকান্দি শহরের ওই সময়কার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা ও হাইলাকান্দির পুরসভার কমিশনার দীনেশ চন্দ্র সিংহ সহ অবিভক্ত কাছাড় জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিয়মিত আসতেন।

ষাটের দশক থেকে সত্তরের

দশকে শিববাড়ির পরিচালনায় বিশেষ বিশেষ পূজাপার্বনে প্রয়াত ফনী ভূষন কর, আনন্দমোহন দেব, ঈশানচন্দ্র দেব, কামাখ্যা প্রসাদ দেব, কানু ধর, সহ কয়েকজন সমাজ কর্মীর নিঃস্বার্থ তৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রয়াত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ত্রৈলক্য মোহন মোহন্ত এবং দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাসের পুত্র স্বরাজ বিশ্বাসের বিমান দূর্ঘটনায় মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের আর্থিক সহযোগিতায় দুর্গা মন্দির স্থাপিত হয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মন্দির পুনঃ নির্মাণ ও চন্ডী মন্ডপ আধুনিকভাবে নির্মাণ করা হয়। শিব মন্দিরটি পুণঃনির্মাণের ব্যাপারে প্রয়াত নেহারুন্দু গুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিনী রত্না গুপ্তের পুত্র নিখিলেন্দু গুপ্তের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের অর্থানুকল্যে নির্মিত হয়েছে। ওই মন্দিরের স্থাপত্যে ও নির্দেশনায় ছিলেন গৌতম গুপ্ত এবং আশিস দাস। শিববাড়ি সেবক সংঘের ওই সময়ের সভাপতি অশোক দত্তগুপ্তের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তখন ছিলো উল্লেখযোগ্য। তিনি সভাপতি থাকা কালীন সময়ে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের সহযোগীতায় চণ্ডীমন্ডপের নবীকরণ করা হয়। চণ্ডীমন্ডপ নির্মাণ কাজে প্রয়াত হরপ্রসাদ দত্তগুপ্ত রনবীর দেব, সাংবাদিক সন্তোষ কুমার মজুমদার সহ পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট কর্মকর্তারা সহযোগিতা করেন। মন্ত্রী গৌতম রায় তখন সাংসদ কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, নেপাল চন্দ্র দাস, দ্বিজেন শর্মা, ললিত মোহন শুক্লবৈদ্য প্রমুখদের সাংসদ তহবিলের অর্থও জোগাড় করে এনে দেন।

আশির দশকের শুরু থেকে দুর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্তের নেতৃত্বে বাসন্তীপূজাও শুরু হয়। দুর্গাপ্রসাদ দত্তগুপ্তের শিববাড়ির প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনায় নিরলস ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তন পুরপতি রঞ্জিত কুমার সাহা তাঁর জীবদ্দশায় শিববাড়ির সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে সহযোগীতা করে গেছেন। অতীতে প্রবীন আইনজীবী প্রমোদ রঞ্জন ভট্টাচার্য, শিক্ষাবিদ প্রমোদ সেনগুপ্ত, ব্রজেশ চন্দ্র দত্তগুপ্ত সহ সবার সহযোগীতায় মন্দিরের প্রতিটি পূজা পার্বন পরিচালিত হতো।

আজ শতাব্দী পেরিয়ে এখনো ঠিক আগের ন্যায় স্বাত্তিকতার সাথে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পরিচালনায় রয়েছেন রনবিজয় দেব (বাপ্পী) সভাপতি, শংকর ব্রত দেব (সম্পাদক), শুভ্র দেব, রাজীব দাসগুপ্ত, চয়ন দত্তগুপ্ত, জয়দীপ দত্তগুপ্ত, সজল কান্তি নাথ প্রমুখ। যুগ যুগ ধরে পূজা অনুষ্ঠিত হওয়া এই মন্দিরটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন -

PRAKASH ENTERPRISES

GROUND FLOOR, HOTEL SHYAMA INN, JANIGANJ BAZAR,
SILCHAR, DIST- CACHAR, ASSAM-788001

MOBILE : 7002504799, 7002802208

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Livguard — RISHABH FAN — KENT Smart Chef Appliances

LIVGUARD -----EVEREADY -----KENT-----RISHABH FAN

BVCL Valley Strong Cement

শারদ শুভেচ্ছা

Valley Strong CEMENT

Phone : 03843-269435, 269881

মাতৃ আরাধনার এই শুভলগ্নে আসুন আমরা
সবাই মিলে মা এবং শিশুর নিরাপত্তা
নিশ্চিত করি। মনে রাখতে হবে আজকের
শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক।

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে সবাইকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন -

অজয় কুমার দত্ত

সদস্য

অসম রাজ্যিক শিশু সুরক্ষা আয়োগ, অসম

Hailakandi (Bengali News Magazine), Vol.-29, No.-6, RNI Regd. No. 64351/96 INR-₹50

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে
জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

ড° হিমন্তবিশ্ব শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, অসম

আনন্দমুখর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে
সকলের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি-

গৌতম গুপ্ত
সভাপতি, ড্রিমস,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, হাইলাকান্দি

Edited, Printed & Published by Jarin Aktar Mazumder on behalf of N. M. Creations, Lala
Dist.-Hailakandi, Assam, E-mail : nmazumderhkd@gmail.com, Phone : 8638898750